The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXV, No. 2, pp 125-144
ISSN 2306-3920

উত্তরবঙ্গের ‘মনসা’ বিষয়ক পরিবেশনায় সংশ্লিষ্ট সমাজ-মানুষের ভূমিরূপের অভিব্যক্তি : একটি প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ

মোহাম্মদ আশরাফুল হাবীব*

[**সার-সংক্ষেপ :** ‘পদ্মার গান’ ও ‘কান্দনী বিষহরির গান’ হিন্দু দেবী মনসাকে কেন্দ্র করে এক ধরনের কৃত্যমূলক উপস্থাপনা, যা আজও বাংলার গ্রামে-গঞ্জে পালা আকারে পরিবেশিত হয়। সনাতন লৌকিক ধর্মের দেবী ‘মনসা’র পূজাকাঙ্ক্ষার কাহিনিকথন ‘পদ্মার গান’ ও ‘কান্দনী বিষহরির গান’ মধ্যযুগের আলোচিত আখ্যানমূলক পরিবেশনা যেখানে মানব-মানবীয় চাওয়া পাওয়া ও আশা-আকাঙ্ক্ষা লভ্য। মঙ্গলকাব্যের পূজালোভী দেব-দেবী বা এ সমস্ত দেবতাগণ কাঙ্ক্ষিত পূজা না পেলে মর্তবাসীর প্রতি অভিসম্পাত ও শাস্তির বিধান করেন আবার পূজা পেলে তুষ্টি লাভ করেন এবং জাগতিক সুখ-শান্তি প্রদান করেন। সে কারণেই এতদ্‌অঞ্চলের মানুষ দেবী মনসার উদ্দেশ্যে বিশেষ কিছু মানত করে; বিশ্বাস ও আস্থা থেকেই মনসাকে মান্য করে। শস্যের অনিষ্ট, মহামারী, রোগশোক, জাগতিক উন্নতি, যাত্রাপথের বিপত্তি, গর্ভপাত প্রভৃতি ইহলৌকিক সঙ্কটের ত্রাণকর্তা হিসেবে এইসকল দেব-দেবী স্মরণীয়। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যপালা *পদ্মার গান/বিষহরির গান/কান্দনী বিষহরির গান* ইত্যাদি নামে অভিহিত নাট্য আঙ্গিকটি উত্তরবঙ্গের বিশেষত কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, রংপুর, লালমনিরহাট, নীলফামারি ও দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে পরিবেশিত হতে দেখা যায়।

এতদ্‌অঞ্চলের লোককলার সাধারণ ও স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারে কৃত্যমূলক নাট্যের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কাঙ্ক্ষিত দেব-দেবীর পূজা-অর্চনার মাধ্যমে তাদের কৃপা কামনা করেন আয়োজক। শুধু আয়োজক নন, সংশ্লিষ্ট সমাজের সামাজিকগণের উপস্থিতিতে সামষ্টিক বোধ-বিশ্বাসের নাট্যিক উপস্থাপনা ঘটে পরিবেশনাগুলোতে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রাপ্ত ‘পদ্মার গান’ ও ‘কান্দনী বিষহরির গান’ নামক পরিবেশনাগুলোর আয়োজক ও সংশ্লিষ্ট সমাজের সংলগ্নতার দার্শনিকতা অন্বেষণ বক্ষ্যমাণ গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য।]

ভূমিকা

বাংলাদেশের মনসা বিষয়ক ঐতিহ্যবাহী নাট্যসমূহ সনাতন-হিন্দু দেবী মনসাকে কেন্দ্র করে ‘পদ্মাপুরাণ’ অবলম্বনে এক ধরনের কৃত্যমূলক উপস্থাপনা। এই নাট্য বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, রংপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুরসহ বিভিন্ন জেলায় গ্রামীণ সাধারণের পৃষ্ঠপোষকতায় ‘মনসার গান’, ‘বিষহরির গান’, ‘পদ্মার গান’, ‘পদ্মাপুরাণ গান’, ‘কান্দনী বিষহরির গান’ ইত্যাদি নামে অভিহিত ও পরিবেশিত হতে দেখা যায়। এছাড়া বরিশাল, খুলনা

---

* **ড. মোহাম্মদ আশরাফুল হাবীব** : সহকারী অধ্যাপক, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, **E-mail** : ashraful.habib@juniv.edu

(রয়ানী গান বা ভাসান গান) নড়াইল (মনসার পাঁচালি), যশোর (ভাসান পালা গান, ঝাপান খেলা), নাটোর (পদ্মাপুরাণ গান), টাঙ্গাইল, কুষ্টিয়া (বেহুলা বা বেইল্যা নাচাড়ি) প্রভৃতি জেলায় বিভিন্ন নামে মনসা সম্পর্কিত এই পরিবেশনাগুলো হয়ে থাকে (Ahmed, 2000: 113-157)। বলা যায়, বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে এই পরিবেশনাগুলোর লালন-পালন এবং পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকেন সংশ্লিষ্ট সমাজের সাধারণ সামাজিকগণ। আবার এই সাধারণ সামাজিকগণই সামষ্টিকের অংশ হিসাবে পরিবেশনা স্থলে দর্শকের ভূমিকায় উপস্থাপিত পরিবেশনার রস আস্বাদন করেন। মূলত গুরু-শিষ্য পরম্পরার পরিবাহিত এই পরিবেশনাগুলোকে গ্রামীণ সমাজ অদ্যাবধি তার আপন জঠরে নিবিড় পরিচর্যা করেছেন বলেই হাজার বছরের ঐতিহ্য নিয়ে এগুলো আজও বাংলার গ্রামে গ্রামে প্রবহমান রয়েছে। লোককলার সাধারণ ও স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারে এতদ্অঞ্চলে পরিবেশিত কৃত্যমূলক নাট্যের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কাঙ্ক্ষিত দেব-দেবীর পূজা-অর্চনার মাধ্যমে তাঁদের কৃপা কামনা করেন আয়োজক। শুধু আয়োজক নন, সংশ্লিষ্ট সমাজের সামাজিকগণের উপস্থিতিতে সামষ্টিক বোধ-বিশ্বাসের নাট্যিক উপস্থাপনা ঘটে এই পরিবেশনাগুলোতে। উত্তরবঙ্গের লালমনিরহাট জেলায় 'পদ্মাপুরাণ গান' ও দিনাজপুর জেলায় প্রাপ্ত 'কান্দনী বিষহরির গান' নামক পরিবেশনাগুলোতে সংশ্লিষ্ট কৃষিজীবী সমাজের সাধারণ ভূমিজ মানুষগুলো কেন আয়োজক-দর্শক বা অভিনেতা হিসাবে ভূমিকা পালন করে অর্থাৎ তাদের সমাজের সামষ্টিক মানুষের সংলগ্নতার দার্শনিকতা অন্বেষণ বক্ষ্যমাণ গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য। এতদ্অঞ্চলের মনসা বিষয়ক 'পদ্মাপুরাণ গান' ও 'কান্দনী বিষহরির গান'-এর পরিবেশনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই পালার প্রতি সংশ্লিষ্ট সমাজের মানুষের মৌলিক প্রবণতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান জরুরি। স্পষ্ট করে বলতে গেলে, বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে উত্তরবঙ্গে মনসা বিষয়ক পরিবেশনার প্রতি সংশ্লিষ্ট সমাজের মানুষের অভিব্যক্তি কীরূপে এবং কেন ক্রিয়াশীল সেটাই বিশ্লেষ্য।

নাট্যাভিনয় নামক শিল্প মাধ্যমটি যেহেতু দর্শক, পরিবেশনার প্রেক্ষিত তথা পারিপার্শ্বিকের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল সেহেতু এর শৈলীর গভীরতর বিশ্লেষণের জন্য Contextual Study –পদ্ধতিও অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। তথ্য-উপাত্ত তথা বিষয়বস্তুর প্রকৃতি বিচার করলে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের গবেষণাকে মূলত বর্ণনামূলক বলা যায়। তবে সামগ্রিক বিচারে, Qualitative Research Methodology অনুসরণ করে প্রবন্ধটি সম্পাদিত হয়েছে। তথ্যের উৎস অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্য 'পদ্মাপুরাণ গান' ও 'কান্দনী বিষহরির গান' পর্যবেক্ষণসহ (Contextual Study) পরিবেশনকারী দল বা সংগঠনের নাট্য প্রয়োগরীতি, শিল্পী ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের দর্শকের মতামত ইত্যাদি পর্যবেক্ষণলব্ধ বিশ্লেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে গবেষণায় প্রযুক্ত হয়েছে। অডিয়ো-ভিজুয়াল রেকর্ডিংসহ মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ এবং সাক্ষাৎকার পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। এছাড়া মনসা বিষয়ক নানা পরিবেশনা এবং সংশ্লিষ্ট আঙ্গিক ও পরিবেশনারীতি বিষয়ক তথ্য এবং মুদ্রিত গ্রন্থের সাহায্যও নেয়া হয়েছে। ক্ষেত্র সমীক্ষণের অংশ হিসাবে ২০২০-এর ফেব্রুয়ারির ১০ তারিখ ও ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৭, ১৮ ও ১৯ তারিখে যথাক্রমে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর থানার গায়েন শ্রী পিযুষ চন্দ্র শুকরু (ক্ষেত্র-সমীক্ষণ, পিযুষ) ও লালমনিরহাট জেলার সদর থানায় বড়বাড়ি ইউনিয়নের বনমালি গ্রামের শ্রী কেশিকান্ত রায় ও শ্রীমতি ইন্দিরা রানীর বাড়ির উঠানে আয়োজিত ও গীদাল উত্তম কুমার (ক্ষেত্র-সমীক্ষণ, উত্তম) ও তার দল পরিবেশিত 'পদ্মাপুরাণ গান'-এর বিশ্লেষণ ও প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হবে। মনসা বিষয়ক আলোচনার পূর্বে উত্তরবঙ্গের সীমানা, ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু এবং এতদ্অঞ্চলে বসবাসকারী রাজবংশী ভাষাভাষী মানুষের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় সম্পর্কে খানিকটা আলোকপাত করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়। কেননা ইতোমধ্যে আমরা জানি, যে কোন ঐতিহ্যবাহী নাট্য পরিবেশনাই স্বীয় অঞ্চলের ভূমি থেকে উৎসারিত এবং উক্ত ভূমিজ সন্তানদের আনুষ্ঠানিক ধর্ম অতিক্রান্ত হাজার বছরের আচরিত বোধ-বিশ্বাসের সৌকর্যমণ্ডিত নাট্যিক উপস্থাপনা।

উত্তরবঙ্গের সীমানা

দশম শতকের কামরূপের রাজা ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনে ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদান সক্রান্ত তাম্রলিপিতে 'উত্তরকুল'-এর উল্লেখ পাওয়া যায় (প্রবেশ ১৯ মে ২০২৩)। ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৬৪৯-৫৮ সালে মুঘল সম্রাট শাহজাহান পুত্র শাহ সুজা বাংলার সুবেদার থাকাকালীন কোচবিহার রাজ্যের কিছু অংশ মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। তার সময়ের রাজস্ব বিষয়ক এক জমাবন্দী কাগজ মোতাবেক জানা যায়, তিনি সমগ্র বঙ্গদেশ ৩৪টি সরকারে বিভক্ত করেছিলেন। যার মধ্যে উল্লিখিত 'উত্তরকুল' নামক ভূ-খণ্ডে একটি নতুন সরকার গঠিত হয়েছিল। এই উত্তরকুল সরকার বা কামরূপের সীমানা ছিল ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর ও পশ্চিমের ভূ-ভাগ। ভুটান পর্বতের পাদদেশ ছিল উত্তরের সীমানা এবং পূর্বদিকের সীমানা ছিল অহম রাজ্য। উত্তরকুল মোট তিনটি পরগনা নিয়ে গঠিত হয়েছিল। এরপর ১৮৭২ সালে ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলায় প্রথম আদমশুমারিতে ৬টি বিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায় (Census of West Bengal -1872)। উক্ত আদমশুমারিতে মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, মালদহ, রাজশাহী, রংপুর, বগুড়া ও পাবনা নিয়ে রাজশাহী বিভাগ এবং দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার নিয়ে কোচবিহার বিভাগ গঠিত বলে উল্লিখিত হয়েছে। ১৮৮১ সালের আদমশুমারিতে ৫টি বিভাগের নাম পাওয়া যায় কিন্তু জায়গীর প্রাপ্ত স্টেট হিসাবে পার্বত্য ত্রিপুরা, উড়িষ্যা ও ছোট নাগপুরের সঙ্গে কোচবিহারও আলাদা থেকে যায়। এরপর ১৯০১ সালে তৎকালীন বৃহৎ বাংলাসহ সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের আদমশুমারিতে বাংলাকে ৮টি বিভাগে বিভক্ত করা হয়। উক্ত আদমশুমারিতে বিশাল বরেন্দ্র অঞ্চল নিয়ে গঠিত রাজশাহী ও কোচবিহার বিভাগকে একসঙ্গে উত্তরবঙ্গ বা উত্তর বাংলা (North Bengal) হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়। মুর্শিদাবাদ, মালদহ, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, রংপুর, দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও সিকিম জেলাসমূহ উত্তরবঙ্গের অধিভূক্ত হয়। শুধু নর্থ বেঙ্গল নয়, ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং ইস্ট বেঙ্গল এই আখ্যা দুটিও ১৯০১ সালের আদমশুমারি রিপোর্টে প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় (Census of India 1901: 16)।

অধুনা বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জ থেকে শুরু করে উত্তর প্রান্তের জেলাসমূহকে উত্তরবঙ্গ হিসাবে চিহ্নিত করা হলেও একেবারে উত্তরের জেলাসমূহের সাথে রাজশাহী অঞ্চলের (রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া) জেলাসমূহের ভাষা ও সংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। যেহেতু কোন অঞ্চলকে বিশেষ রূপে চিহ্নিত করতে হলে উক্ত অঞ্চলের ভূমিরূপ, আবহাওয়া, ভাষা ও সংস্কৃতির অভিন্নতা বিবেচনায় রাখা বাঞ্ছনীয়। সেহেতু বক্ষ্যমাণ গবেষণায় হিমালয়ের পাদদেশের ভূ-খণ্ডসমূহ- বৃহত্তর রংপুর (রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, গাইবান্ধা), বৃহত্তর দিনাজপুর (দিনাজপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও), দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, সিকিম ও আসামের কিছু অংশকে প্রাচীন উত্তরবঙ্গ এবং বাংলাদেশ পর্যায়ে উপরি-উল্লিখিত সর্ব উত্তরের ৮টি জেলাকে বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের এই ৮টি জেলায় বসবাসকারী রাজবংশী সম্প্রদায় এবং এদের রাজবংশী বা কামতাপুরী ভাষা ও কৃষ্টি গবেষকের এরূপ সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি হিসাবে উল্লেখ করা যায়।

উত্তরবঙ্গের মানুষের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ও রাজবংশী সম্প্রদায়

ভারতবর্ষে আর্যদের আগমনের পূর্বে যে সকল আদি অস্ট্রেলীয় ও আদি অস্ট্রিকভাষী নরকায় এবং মঙ্গোলীয় কিরাতজাতিভুক্ত মানবগোষ্ঠীর নানা ভাষাভাষী মানুষের জনপদ ছিল, তারা এখনও নানা গোত্রে (Clan) বিভক্ত। যদিও অস্ট্রিকভাষীদের অস্ট্রেলিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব উপকুলে প্রাচীনকালে আগমন ঘটে, তথাপি তারা আর্যদের বহুকাল পূর্বেই এক সভ্য জাতি হিসাবে ভারতবর্ষে আসে। তাদের মধ্যে এই আদি অস্ট্রেলীয় ও মঙ্গোলীয় কিরাত এই দুই

নৃগোষ্ঠীর মানুষেরাই ছিল অনেকাংশেই অনগ্রসর এবং তাদের মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই গোত্রপ্রথার প্রচলন ছিলো- যা এখনো বহাল আছে।

উত্তরবঙ্গের মানুষের নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস অনুসন্ধানে জানা যায়, মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীর একটি দুর্ধর্ষ ও বর্বর শাখার অধিবাসী 'মেচ' জনগোষ্ঠী। যারা ভুটান, তিব্বত প্রভৃতি হিমালয়ের পাদদেশের পার্বত্য অঞ্চলের আদি বাসিন্দা। দশম শতকের কাছাকাছি সময়ে মঙ্গোলীয় রক্ত ধারার 'বোড়ো' (Bodo) জাতিগোষ্ঠী দক্ষিণ-পশ্চিম চীন থেকে ভারতে প্রবেশ করে এবং ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকা হয়ে সমগ্র আসাম ও উত্তরবঙ্গ এবং বিহারের কিছু অংশে ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে পশ্চিম দিক থেকে আগন্তুক একটি নেগ্রিটো বা কৃষ্ণকায় আদিম জাতি পূর্ব-মধ্যভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলে যাযাবরের ন্যায় ঘুরে বেড়াতো। কোনো এক সময় এই যাযাবর জনগোষ্ঠী সম্ভবত শক্তিশালী আর্য জাতির অনুপ্রবেশের ফলে ঐ অঞ্চল ত্যাগ করে উত্তরপূর্ব মুখে অগ্রসর হয়ে *মহাভারত*-এর মৎস্যদেশ নামে অভিহিত কোচবিহার, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার সঙ্গমস্থলের নিম্নজলাভূমিতে বসতি স্থাপন করে। গঙ্গা অববাহিকা থেকে আগত নেগ্রিটো প্রলক্ষণযুক্ত কৃষ্ণকায় এই জাতিগোষ্ঠী এবং মঙ্গোলীয় বোড়ো জনগোষ্ঠীর মধ্যে বহুকাল ধরে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ও জৈবিক সংমিশ্রণের ফলে নতুন জাতিগোষ্ঠী হিসেবে 'কোচ'দের উদ্ভব ঘটে।

নৃতাত্ত্বিকভাবে এরা কিরাত জাতিভুক্ত ভোট-ব্রহ্ম শাখার নরকায় হলেও তাদের মাঝে অস্ট্রিক রক্তধারার কিঞ্চিৎ মিশ্রণ ঘটেছে বিধায় আদি চেহারা ও শারীরিক গঠনের পরিবর্তন ঘটেছে। যে কারণে তাদর গায়ের রং সম্পূর্ণ হরিদ্রাভ নয়। অনেকেরই কিছুটা উজ্জ্বল কৃষ্ণকায়-শ্যামবর্ণের। তথাপি তাদের রক্তধারায় সামান্য মঙ্গোলপ্রতিম (মজিদ, ২০২৩ : ১৯)। শারীরিক গঠনের দিক থেকে এই কোচ-রাজবংশীরা খর্বকায়, চ্যাপ্টা মুখমণ্ডল, প্রশস্ত নাক, উঁচু গণ্ডাস্থি, ছোট কালো চোখ ও উঁচু চোয়ালবিশিষ্ট, চুল সোজা থেকে ঈষৎ ঢেউ খেলানো, দাড়ি-গোঁফ কম, দেহ পীত থেকে ঈষৎ কালোর দিকে এক মিশ্র জনগোষ্ঠির মানুষ। যদিও রাজবংশীরা প্রাচীনকালে পূর্ব ভারতের অন্যান্য আদিম মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠী ও ভারতের অভ্যন্তরে আদিম নানা অস্ট্রিক নৃগোষ্ঠীর ন্যায় জড় উপাসক বা সর্বপ্রাণবাদী (Animist) ছিল (মজিদ, ২০২৩ : ২২)।

পশ্চিমে কামতা (উত্তরবঙ্গ) এবং পূর্বে অহোম (আসাম) রাজ্য। অহোমরা আসাম বা কামরূপে এবং কোচরা কোচবিহারে ও বৈকুণ্ঠপুরে স্থায়ী প্রভাব ও রাজ্য বিস্তার করে। বোড়ো জাতিভূক্ত কোচদের প্রথম নেতার নাম 'হাজো'। হাজো 'খেন' জাতিদের পরাজিত করে ১৪৯৬ সালে রাজ্য স্থাপন করেন। হাজোর দুই কন্যা 'হীরা' ও 'জীরা'র বিবাহ হয় আসামের গোয়ালপাড়ায় অবস্থিত চিক্কাপাহাড় নিবাসী 'মেচ' জাতিগোষ্ঠীর হরিদাস বা হারিয়া মণ্ডল-এর সঙ্গে। কোচ ও মেচ-এর অন্তর্বিবাহ বা সংমিশ্রণ এই দুই জাতিগোষ্ঠীকে একত্র করে দেয়। এই হারিয়া মণ্ডল হলেন কোচ রাজবংশের পিতৃপুরুষ। হাজোর দৌহিত্র ও জীরা'র গর্ভজাত পুত্র 'চন্দন' হন কোচদের প্রথম রাজা। তিনি ১৫১০ সালে চিক্কাপাহাড়ে রাজ্য স্থাপন করেন। এরপর তিনি রাজ্য স্থানান্তরিত করেন কোচবিহারে। চন্দনের মৃত্যুর পর তার বৈমাত্রেয় ভাই হীরাপুত্র বিশু 'বিশ্বসিংহ' (১৫১৫-৪০ খ্রি.) নাম ধারণ করে কোচবিহারের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ষোলো শতকের গোড়ার দিকে কোচদের একটি অংশ রাজা বিশ্বসিংহের নেতৃত্বে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে। বিশ্বসিংহ কামরূপ, অযোদ্ধা, কনৌজ ও মিথিলা-তিরহুত থেকে বৈদিক ব্রাহ্মণদের নিয়ে এসে এতদ্অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করেন।

এতদ্অঞ্চলের কোচ জনগোষ্ঠি যখন নিজস্ব প্রাচীন সর্বপ্রাণবাদী ধর্ম পরিত্যাগ করে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ কিংবা ব্রাহ্মণ্যবাদীরা যখন তাদের ওপর হিন্দুত্ব চাপিয়ে দেয়, তখন তারা নিজেদের দ্বিতীয় শ্রেণির হিন্দু হিসাবে কেউ কেউ ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করে। তাদের অনেককে নিম্নবর্ণের বৈশ্য ও শুদ্র হিসাবে পরিগণিত হয়ে ব্রাত্য শ্রেণির হিন্দুত্ব গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু কোচদের দাবী ছিল ক্ষত্রিয়ত্ব।

পরবর্তীকালে এই কোচরাই কোচ রাজবংশের উত্তরাধিকারী হিসাবে তারা নিজেদের ‘রাজবংশী’ বলে আখ্যাত করে স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে। এভাবে তাদের ‘কোচ’, ‘মেচ’ নাম ঘুচে গিয়ে উদ্ভব ঘটে ‘রাজবংশী’ নামের (হক, ২০০৭: ৩৬-৩৮)। এই রাজবংশীগণ ক্ষত্রিয় পদবী রায়, রায় বর্মণ, সিংহ ইত্যাদি গ্রহণ করে। অদ্যাবধী উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন হিন্দু অধুষ্যিত গ্রামগুলোতে উক্ত পদবীধারী মানুষের বসবাস রয়েছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে রচিত *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ* (১৬শ শতাব্দী)-এ অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য হিসাবে রাজবংশীদের কথা বলা হয়েছে। তথাপি বেদ, পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্রসমূহে কোথাও রাজবংশীদের কথা উল্লেখ নেই। অন্যদিকে “কোচদের যে অংশ হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেনি, তারা ক্রমশ ইসলাম গ্রহণ করে ‘কেওট রাজবংশী’ নামে পরিচিত হয়” (আহমেদ, ২০০৯: ১১)। বলা বাহুল্য যে, বাংলাদেশে মুসলিম রাজবংশী কম দেখা গেলেও ভারতের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আসামে তাদের উপস্থিতি রয়েছে। হিন্দু ধর্ম গ্রহণকারী ‘রাজবংশী’ ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী ‘কেওট রাজবংশী’ উভয় শ্রেণির মানুষের সমাজকাঠামোতে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হলে, পরবর্তীকালে তারা মাতৃতান্ত্রিকতা থেকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় প্রবেশ করে। ফলে সমাজ জীবনে নারীর স্থলে পুরুষের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা পায়। কিন্তু তাদের ফেলে আসা কোচ জীবনধারার অনেক সংস্কার, বিশ্বাস, প্রথা, প্রতিষ্ঠান পরবর্তী সময়েও বহাল থেকে যায়।

ভারতবর্ষে আর্যগণের আগমনের পর আর্যরা তাদের আধিপত্য ও অর্থনৈতিক শোষণের স্বার্থে এই সকল আদিবাসীদের তাদের বর্ণভিত্তিক ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুধর্ম চাপিয়ে দেয়। তাদেরকে নিম্নবর্ণের ও নিম্নবর্গের হিন্দুত্বে পরিণত করে সমাজে ব্রাত্যজন হিসাবে পরিগণিত করে। অবশ্য সকলের ক্ষেত্রে সম্ভব না হলেও অনেকগুলো আদিবাসীর ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা তা সম্ভব করে তোলে। কোচ, হাজং, ত্রিপুরা, পালিয়া, কৈবর্ত্য, মালো প্রভৃতি জনগোষ্ঠী তাদের অন্যতম। তৎসত্ত্বেও এ সকল নৃগোষ্ঠী তাদের পুরাতন লোকজধর্ম পুরোপুরি পরিত্যাগ করেনি। যদিও হিন্দুদের প্রায় সকল দেব-দেবীরইতারা পূজা-অর্চণা করে। তথাপী রাজবংশী সম্প্রদায়ের প্রতিটি পাড়ায় অনার্য দেবী কালী ও মনসার জন্য মন্দির রয়েছে, রয়েছে নানা ব্রতাচার। এছাড়া তাদের আদিম পূজা যেমন- হুঁদুম দেও, তিস্তাবুড়ি, মণিকা রায়, রূপা রায়, সোনা রায়, মদনকাম, সন্নাসী পূজা, ত্রিনাথের পূজা, চড়ক পূজা, বাস্তুদেবতার পূজা, হ্যাঁচড়া পূজা, চৈতী পূজা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

Bangladesh District Gazetteers-এর বরাত দিয়ে ওয়াকিল আহমদ জানান, “the Koch worship Siva while the Rajbansis are mainly Vaisnabs” (আহমেদ, ২০০৯: ১২)। উপরোক্ত Bangladesh District Gazetteers-এর বক্তব্যটি বিশেষভাবে বিশ্লেষণযোগ্য। আদিম কোচ সম্প্রদায় ধর্মান্তরকরণের সাথে সাথে শিবপূজা থেকে বিষ্ণুভক্তে পরিণত হয়, ফলে তারা ‘বৈষ্ণব’ হয়। বৈষ্ণব সম্প্রদায় অনুসারীরা সাধারণত ‘বৈষ্ণব’ নামে অভিহিত। বৈষ্ণবরা হিন্দু ধর্মের একটি শাখা সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের নিকট নারায়ণ বা বিষ্ণু ও তার অবতারগণ- মূখ্যত রাম ও কৃষ্ণ, আদি তথা সর্বোচ্চ ইশ্বররূপে পুজিত হন। কেননা বৈষ্ণব দর্শনে বিষ্ণুকে সমগ্র জগতের পালনকর্তা রূপে গণ্য করা হয়। ধর্মবিশ্বাস ও ভক্তি চর্চায় বৈষ্ণবধর্মের প্রধান তাত্ত্বিক ভিত্তি হলো বেদ ও তৎসংশ্লিষ্ট পৌরাণিক শাস্ত্র। যেমন-পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ভগবদ্গীতা ও ভাগবত পুরাণ। তাহলে এরূপ ধারণা করা অসঙ্গত নয় যে, যদিও প্রাচীনকাল থেকেই অনার্য দেব-দেবীগণ কোচ, মেচ, বোড়ো সম্প্রদায়ের মানুষের পূজনীয় ছিল, তা সত্ত্বেও রাজবংশী সম্প্রদায় ধর্মান্তকরণের কারণে শিবকে ত্যাগ করে বিষ্ণুর পূজারী হলেন তারা চণ্ডীর প্রতিদ্বন্দ্বী এবং শিব ভক্তের চরম বিদ্বেষিণী মনসাকেই সাদরে গ্রহণ করবেন-এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং ষোড়শ শতককে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের মাঝে মনসার পূজারী হিসাবে মনসা বিষয়ক বিভিন্ন পরিবেশনার প্রচলন হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত নেয়া অমূলক হবে না।

বাংলাদেশের রংপুর বিভাগের তিস্তা নদী দ্বারা মূল ভূখণ্ড হতে বিভক্ত উত্তর অংশ বিশেষত পূর্বের বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর জেলা বর্তমানের গাইবান্ধা, রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট,

নীলফামারী, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও জেলা, বাংলাদেশের বাইরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং-এর সমতল অঞ্চল, আলিপুরদুয়ার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় কোচ রাজবংশী (Rajbansis) সম্প্রদায়ের বাস। তাছাড়া আসাম রাজ্যের গোয়ালপাড়া, কোকড়াঝাড়, ধুবড়ী জেলা এবং মেঘালয় ও নেপালের ঝাপা জেলাতে এই জাতিগোষ্ঠীর মানুষের উল্লেখ পাওয়া যায়।

উত্তরবঙ্গের ভূমিরূপ ও জলবায়ু

প্রাচীনকাল থেকেই রাজবংশী সমাজ কৃষিভিত্তিক। কৃষিকাজই তাদের মূল পেশা, পাশাপাশি রয়েছে পশুপালন। এছাড়া রয়েছে ধীবরবৃত্তি- মৎস শিকারের উদ্দেশ্যে জেলে হিসাবে তাদের বাড়ি থেকে অনেক দূরবর্তী স্থানের নদী-জলাশয়ে তাদের যেতে হয়। রাজবংশীদের মাঝে পুরুষ অপেক্ষা নারীরা অধিক কর্মক্ষম।

আবার বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের থেকে উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও আবহাওয়ার কিছুটা স্বাতন্ত্র্য আছে। শীত গ্রীষ্ম দুই ঋতুতে প্রকৃতি চরমভাবাপন্ন রূপ ধারণ করে। অর্থাৎ আবহাওয়া তুলনামূলকভাবে শীতকালে অধিক শীত এবং গ্রীষ্মকালে অধিক গরম। গ্রীষ্মপ্রধান চরমভাবাপন্ন আবহাওয়ায় হিমালয়ের পাদদেশের জঙ্গলে বিষধর সাপের বসবাসের উপযুক্ত স্থান। বর্ষাকালে জলীয় বাষ্প হিমালয়ে বাঁধা পেয়ে তৎসংলগ্ন এলাকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায় কিন্তু উঁচু ভূমিরূপ হওয়ায় পানি জমে বন্যার সৃষ্টি করে না। তবে নদী তীরবর্তী নিচু এলাকাগুলোতে প্রায়শই বন্যা হয়, তাছাড়া খরার প্রভাবই বেশি। উত্তরবঙ্গে ব্রহ্মপুত্র ছাড়া বড় নদী নেই, আছে ছোট ছোট নদী- সেগুলোতে পাহাড়ি ঢল নামলে খরস্রোতা হয়। তিস্তা, তোরষা, ক্ষিরোল, করতোয়া, ধরলা, মানসাই, মানাস, আত্রাই, কালজানি, মহানন্দায় পাহাড়ি ঢল নামলে পানির তোড়ে পাহাড় থেকে নেমে আসে বিষধর সাপ। নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হলে সাপের উপদ্রবও বেড়ে যায়। সাপের কামড়ে মৃত্যু তখন নিত্য-নৈমিত্তিকের ঘটনা। এছাড়া উত্তরাঞ্চরের তরাইভূমি, পাহাড়ের পাদদেশে অরণ্যভূমি, জলাজঙ্গলা, খরস্রোতা নদী, হাজামজা নদীর চর, অনাবাদী প্রান্তর ইত্যাদি সাপের বসবাসের জন্য উপযুক্ত স্থানও বটে। *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য গ্রন্থে* আহমদ শরীফ বলেন,

> রক্তহীন সাপ শীতে কাবু থাকে। বৈশাখের উষ্ণতা পেয়ে শীতাবাস গর্ত থেকে সাপ বের হতে থাকে। লোকবসতি অঞ্চলে তখন থেকেই তার উপদ্রব শুরু হয়। বৈশাখ থেকে শ্রাবণ অবধি মনসা পূজার কাল। তারপর শ্রাবণ মাস অবধি প্রবল বর্ষণের তোড়ে আরণ্য-পার্বত্য অঞ্চলে বন্যার স্রোতে পড়ে সাপ সমতল লোকালয়ে আশ্রয় নেয়। তাই এসময়েই সর্পভয় সার্বক্ষণিক শঙ্কায় পরিণত হয়। সব সাপকে স্তুতি পূজা করবার জন্য পাওয়া যাবে না, তাই সাপের মতো দুজ্ঞেয় চরিত্রের অসূয়াপরায়ণা কোপনস্বভাবা নারীপ্রতিক কল্পনা করা হয়েছে (শরীফ, ২০০৮: ২৬৫)।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের গবেষকের ক্ষেত্র সমীক্ষণের স্থানেও (লালমনিরহাট জেলার সদর থানা, বড়বাড়ি ইউনিয়নের বনমালি গ্রাম) তিস্তা নদীর ঢলে প্রায়শই জলাবদ্ধ অবস্থার সৃষ্টি হয় বলে জানা গেছে। এ প্রসঙ্গে লালমনিরহাট জেলার সদর থানাস্থিত বড়বাড়ী ইউনিয়নের টিংবিদ্যা বাগিস গ্রামের শ্রী অতুল চন্দ্র ভক্ত-এর বক্তব্য উল্লেখ করা হলো। কিন্তু দৃষ্টি আকর্ষণযোগ্য বিষয় হলো, তার বক্তব্যে সাপ বা সর্পকুলের নাম উল্লেখ না করে 'ওরা' বা 'ওনারা' শব্দবন্ধ ব্যবহার করে ভক্তি ও ভয় মিশ্রিত কণ্ঠ খাঁদে নামিয়ে তিনি জানান,

> বর্ষার সময় পুরা-প্রচুর পানি হয়। গত ১৭ (২০১৭) সালের বন্যায় তো এখানে এক বুক করি পানি ছিল। [...] উপদ্রব তো বাড়বেই। বাড়ায় মানে বাইরে থেকে যে আসে না ওনারা? বাইরে থাকি কতকগুলা ভাসানি (ঢল) আইসে। আসিয়া তো এখানে ওনারা

> আশ্রয় নেয় জঙ্গলে। যখন জলটা নামি যায়, আশ্রয় নেওয়ার পর দেখা যায়- মাঝে সাঝে দেখা যায়। নামিও যায় ওরা (সাপ)।

মনসার পরিচয়

সাধারণত লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্যকথা এবং মাহাত্ম্যকথা সম্বলিত পাঁচালিগুলো 'মঙ্গল' বা 'বিজয়' নামে পরিচিত। শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য-এর মতে, "আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে যে বিশেষ এক শ্রেণীর ধর্মবিষয়ক আখ্যানকাব্য প্রচলিত ছিল, তাহাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গল কাব্যনামে পরিচিত" (ভট্টাচার্য, ২০২০: ১১)। বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে সনাতন লৌকিক ধর্মের বিভিন্ন দেব-দেবীর মাহাত্ম্য প্রকাশ উপলক্ষ্যে যে সকল প্রাচীন কাহিনি ও রূপকথা একত্রিত হয়ে গেয় আখ্যানকাব্যে রূপ নিয়েছে তার মধ্যে দেবী মনসাকে নিয়ে 'মনসাবিজয়' বা 'মনসামঙ্গল' বা 'পদ্মাপুরাণ' সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী এবং অন্যতম জনপ্রিয় কাব্যধারা। এতদ্অঞ্চলের সাধারণ জনজীবনে দেবী মনসা নিজে নাগ বা সাপ না হয়েও সর্পদেবী বা সর্পরাণী হিসাবে পরিগণিত। পুরাণকাহিনি অবলম্বনে এই সর্পদেবী মনসার জনপ্রিয় নাম 'পদ্মাদেবী', অন্য নাম 'নিত্যা (চিরন্তনী)'। আহমদ শরীফ-এর মতে, "এর অনার্য নাম জাঙ্গুলী, ব্যাজোক্তিমূলক সাধারণ নাম বিষহরি [...] আবার 'বিশাল অক্ষি' অর্থে বিশালাক্ষী বা বিষালাক্ষীও বটে" (ভট্টাচার্য, ২০২০: ২৬৪)। এতদ্অঞ্চলে মনসা প্রকাশিত হয়েছে চণ্ডীর প্রতিদ্বন্দ্বী এবং শিব ভক্তের চরম বিদ্বেষিণী হিসাবে। মনসার পরিচয় সম্পর্কে *পৌরাণিক অভিধান*-এ বলা হয়েছে, "সর্পগণের দেবী। ইনি জরৎকারু মুনির স্ত্রী, আস্তিকের মাতা এবং বাসুকির (সর্পরাজ) ভগিনী। ব্রহ্মার উপদেশে কশ্যপ সর্পমন্ত্রের সৃষ্টি করে তপোবলে মন দ্বারা এঁকে মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে উৎপাদন করেন; সেই জন্য ইনি মনসা এবং এঁকে কশ্যপের মানসী কন্যা বলা হয়" (সরকার, ১৪১৫: ৩২৩)।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, প্রায় সমগ্র পৃথিবী জুড়েই আদিবাসী সমাজে কোনও না কোন রূপে সর্পপূজার প্রচলন ছিল। প্রাচীন অরণ্যচারী মানবের কাছে অরণ্যের ভয়ঙ্কর জীবজন্তুর মধ্যে সাপ সবচেয়ে ভয়ের কারণ ছিল। তাই আদিম যুগ হতেই সাপ এতদ্অঞ্চলে মানুষের কাছে ভয় ও পূজার লক্ষ্য ছিল। পণ্ডিতদের ধারণা, প্রায় ছয় হাজার বছর পূর্বে প্রাচীন মিশরে Snake-cult ev Serpent-lore-এর প্রচলন ছিল। উদ্যত সর্প ফণা মিশরের দেবতা ও রাজাদের শিরস্ত্রাণগুলো শোভা পেত। মিশরীয় দেবী 'মেডুসা'-র গলায়, হাতে, বাজুতে, কোমড়ে সাপই ছিল সৌন্দর্য ও শক্তি অলঙ্কার। তবে ইউফ্রেটিস নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী তুরানী জাতির মধ্যে সর্বপ্রথম সাপকে দেবতা জ্ঞানে পূজারীতি শুরু হয়েছিল বলে পণ্ডিতদের ধারণা। এও ধারণা করা হয় যে, এই তুরানী জাতি থেকেই ভারতীয়রা সর্পপূজার সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিল। প্রাচীন ঋগ্বেদে কয়েকজন সর্পঋষির নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। অর্বাচীনকালেও ভারতীয় উপমহাদেশের প্রায় সর্বত্র, বিশেষত বাংলাদেশে, বাস্তুসাপ (গোক্ষুর সাপ- Indian Cobra/Spctacled Cobra) বলে পরিচিত এক জাতীয় গৃহবাসী সাপ গৃহস্তের নিকট পরম শ্রদ্ধা লাভ করে থাকে। অধিকন্তু ভারতবর্ষের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এই সাপ সংখ্যায়ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিক। *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস* গ্রন্থে শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য-বলেন,

> সম্মুখযুদ্ধে ইহাদের পরাজিত করিবার উপায় নাই, ইহাদের সন্ধান অলক্ষ্যগোচর; বিশেষত ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি অন্যান্য জীবজন্তু হইতে স্বতন্ত্র–ইহারা পাদহীন অথচ দ্রুতগতি, জীর্ণ খোলস ত্যাগ করিয়া ইহারা বারবার নবজীবন লাভ করে; সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয়, ইহারা অমর–দীর্ঘকাল নিঃশ্বাস রোধ করিয়া নিরাহারে কালযাপন করিতে পারে,–এই সমস্ত কারণে এই বিশেষ জীবটি সম্মন্ধে প্রাক্-সভ্যতা যুগের সমাজভূক্ত মানবমাত্রেরই হৃদয়ে একটি কৌতূহলমিশ্রিত ভয়ের অস্তিত্ব ছিল। সভ্যতার

> ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই ভয়ই তথাকথিত ভক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে (ভট্টাচার্য, ২০২০: ২৪৯)।

নীহাররঞ্জন রায়-এর মতে, "সাপ প্রজনন শক্তির প্রতীক এবং মূলত কৌম সমাজের প্রজনন শক্তির পূজা হইতেই মনসা পূজার উদ্ভব, এতথ্য নিঃসন্দেহ। [...] বাঙলাদেশে যে-সব মনসাদেবীর প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রায় প্রত্যেকটিতেই মনসাদেবীর সঙ্গে একাধিক সর্পের, ক্রোড়াসীন একটি মানবশিশুর, একটি ফলের এবং কোথাও কোথাও একটি পূর্ণঘটের প্রতিকৃতি বিদ্যমান। ইহাদের প্রত্যেকটি প্রজনন শক্তির প্রতীক" (রায়, ১৪০০: ৪৮৯)। অন্যদিকে, সেলিম আল দীন কৃত *বাংলা নাট্যকোষ*-এ মঙ্গলকাব্য অনুসারে পদ্মা বা মনসা ও নেতার জন্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে,

> শিবের স্খলিত রেত পদ্মের নাল বেয়ে পাতালে যায়। তার ফলে হয় মনসার জন্ম। এ জন্য মনসার অপর নাম পদ্ম। লোকমতে- শিব অস্থান থেকে একটি পদ্মা ছিঁড়ে আঘ্রাণ করলে অকস্মাৎ হাঁচি দেন। এই হাঁচি থেকে মনসার জন্ম তাই তাঁর নাম 'পদ্ম'। সেই হাঁচির ফলে শিবের নেত্র থেকে যে অশ্রু গড়ায় তা থেকে (নেত্র থেকে) তার সখী বা বোন 'নেতা'র জন্ম (দীন, ১৯৯৮: ২৩৪)।

পুরাণ ও মঙ্গলকাব্যে মনসার জন্ম ও পিতৃপরিচয় বিষয়ে ভিন্নমত থাকলেও *Sacred Places of Goddess: 108 Destinations* গ্রন্থ অনুসারে Karen Tate মনে করেন (অনুবাদ গবেষককৃত),

> খ্রিস্টীয় ১৪ শতাব্দীতে মনসা প্রজনন ও বিবাহের দেবী হিসাবে চিহ্নিত হন এবং শিবের আত্মীয় হিসাবে শৈব দেবগোত্রের অন্তর্ভূক্ত হন। কিংবদন্তি অনুসারে, শিব বিষ পান করার পর মনসার মধ্যে তার সঞ্চার হয় এবং মনসা 'বিষহরা' (Remover of Poisons) নামে পরিচিত হন। [...] ধীরে ধীরে মনসা কেন্দ্রিক ধর্মীয় গোষ্ঠীটি শৈবধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হয়। এর ফলে শিবের কন্যারূপে মনসার জন্মের উপাখ্যানটি রচিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত শৈবধর্ম এই অনার্য দেবীকে হিন্দু ধর্মের মূল ধারায় অন্তর্ভূক্ত করে নেয় (Tate, 2006: 194)|

পুরাণ কিংবা মঙ্গল কাব্যে যতই বিরোধ থাকুক না কেন এতদ্‌অঞ্চলের সামাজিকের নিকট তা একেবারেই অবান্তর। বিশ্বাসীদের নিকট তা শুধু অবান্তর নয়, নিরর্থকও বটে। আহমদ শরীফের মতে, "দুনিয়ার প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলোর নায়ক-নায়িকারা যেমন বাস্তব মানুষের চেয়েও বাস্তব এবং প্রখ্যাত হয়, চাঁদ, বেহুলা, লক্ষীন্দর, চম্পা, উজানিনগরও তেমনি বাস্তব এবং প্রসিদ্ধ। কাজেই ঐতিহাসিকতা সন্ধান করা নিরর্থক" (শরীফ, ২০০৮: ২৬৬)। গবেষকের মতে, পূর্ব বাংলায় সর্পদেবী মনসা কেন্দ্রিক পাঁচালির উদ্ভব এবং বিকাশ ঘটেছিল। চাঁদ-বেহুলার কাহিনিও বিশেষ করে আসাম ও পূর্ব বাংলার। 'মনসামঙ্গল' শুরুতে ব্রতকথা বা ব্রতগীত হিসেবে প্রচলিত হলেও পরবর্তীকালে মঙ্গলকাব্যের রূপ পরিগ্রহ করে। মঙ্গল লক্ষ্যে এই ব্রতকথা গীত হয় বলে এর অন্য নাম মঙ্গলগীতি এবং পঞ্চালিকার অভিনয় মাধ্যমে মঙ্গলগীতি বা প্রশস্তি ও প্রার্থনা নিবেদন করা হয় বলে অথবা দোহার যোগে গীত হয় বলে এর অন্য নাম পাঞ্চালী বা পাঁচালি (শরীফ, ২০০৮: ২৫৮, ২৬৪)। দশম একাদশ শতকে মনসা পূজার সূত্রপাত হয় বলে পণ্ডিতদের ধারণা, তবে ত্রয়োদশ শতকের কবি কানাহরি দত্ত মনসামঙ্গলের আদি কবি হিসাবে স্বীকৃত। *মনসামঙ্গল* কাব্যগুলোর মধ্যে কানাহরি দত্ত, বিপ্রদাস পিপলাই, বিজয়গুপ্ত, নারায়ণ দেব, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ও দ্বিজবংশীদাসের রচনা উল্লেখযোগ্য।

মনসা বিষয়ক পরিবেশনা : 'পদ্মপুরাণ গান' ও 'কান্দনী বিষহরির গান'

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জেলাগুলোতে এই অনার্য দেবী মনসা সম্পর্কিত পরিবেশনাগুলো অর্বাচীনকালেও নিয়মিতভাবে পরিবেশিত হয়ে থাকে। সৈয়দ জামিল আহমেদ তাঁর *Acinpakhi*

Infinity: Indigenous Theatre of Bangladesh গ্রন্থের Performance Related To Manasa অধ্যায়ে মনসা সম্পর্কিত ১২টি পরিবেশনা আঙ্গিকের নাম নিম্নরূপে উল্লেখ করেছেন।

1. Padma-Puran Gan (Rangpur)
2. Rayani Gan
3. Manasar Pacali
4. Padma-Puran Gan (Natore)
5. Bhasan Gan
6. Bhasan Pala Gan
7. Bisaharir Gan
8. Beilya Nacari
9. Bhasan Yatra
10. Jhapan Khela
11. Manasar Gan (Pacali)
12. Manasa Bhasan Yatra

গবেষকের মতে, "পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে পদ্মাপুরাণ গান পরিপূর্ণ নাট্যধারার রূপ লাভ করে এবং ষষ্ঠদশ শতকে মঙ্গলকাব্যের বিকাশের যুগে এই আখ্যানের পরিবেশনা সারা বাংলায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে" (জাকারিয়া, ২০০৮: ৩০১)। সনাতন লৌকিক ধর্মের দেবী 'মনসা'র পূজাকাঙ্ক্ষার কাহিনিকথন 'পদ্মাপুরাণ গান' বা 'কান্দনি বিষহরির গান' মধ্যযুগের আলোচিত আখ্যানমূলক পরিবেশনা যেখানে মানব-মানবীয় চাওয়া পাওয়া ও আশা-আকাঙ্ক্ষা লভ্য। মঙ্গলকাব্যের পূজালোভী দেব-দেবী বা এ সমস্ত দেবতাগণ কাঙ্ক্ষিত পূজা না পেলে মর্তবাসীর প্রতি অভিসম্পাত ও শাস্তির বিধান করেন। আবার পূজা পেলে তুষ্টি লাভ করেন এবং ভক্তের জন্য জাগতিক সুখ-শান্তি ও সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্মৃদ্ধি প্রদান করেন। সে কারণেই এতদ্অঞ্চলের মানুষ দেবী মনসার উদ্দেশ্যে বিশেষ কিছু মানত করে; ভয়-বিশ্বাস ও আস্থা থেকেই মনসাকে মান্য করে। শস্যের অনিষ্ট, মহামারী, রোগশোক, জাগতিক উন্নতি, যাত্রাপথের বিপত্তি, সন্তান কামনা বা গর্ভপাত প্রভৃতি ইহলৌকিক সঙ্কটের ত্রাণকর্তা হিসেবে এতদ্অঞ্চলের সাধারণ সামাজিকগণের কাছে মনসাদেবী স্মরণীয়। এছাড়াও পুরাণ কথা অনুসারে জানা যায়- সহস্রফণা সাপ বা অনন্ত নাগ পৃথিবী ধারণ করে রয়েছে। আহমদ শরীফের মতে,

> গ্রীষ্ম প্রধান দেশের মানুষ 'সাপ'কে অবহেলা করতে পারেনি। সাপের দ্রুত সর্পিল গতি, জলে-স্থলে-ভূগর্ভে তার সহজ সঞ্চরণ, তার জীবনবিনাশী বিষ, তার বর্ণালী রূপ, তার ফণার সৌন্দর্য, তার দৈহিক শক্তি, তার আত্মগোপনের কৌশল, তার ত্বক বদলানো, তার প্রজনন সামর্থ্য প্রভৃতি আদি মনুষ্য সমাজের সভয়-সশ্রদ্ধ সকৌতুহল দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাই সামীয় জগতে (Semetic world) সাপ ও সাপচরিত্র সম্বন্ধে পুরাণ কাহিনি গড়ে উঠেছে (শরীফ, ২০০৮: ২৬৪)।

লালমনিরহাট জেলার সদর থানায় বড়বাড়ি ইউনিয়নের শ্রী কেশিকান্ত রায় ও শ্রীমতি ইন্দিরা রানীর বাড়ির উঠানে তিন দিনব্যাপী আয়োজিত 'পদ্মাপুরাণ গান' এবং দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুরে চণ্ডিপুর-বাবু পাড়া নিবাসী শ্রী পিযুষ চন্দ্র রায় শুকরু গায়েনের 'কান্দনী বিষহরির গান' পরিবেশনা দুটি স্থানীয়ভাবে পরিচিত 'মারাখচা' রীতিতে সম্পন্ন হতে দেখা যায়। উল্লেখিত 'মারাখচা' রীতিটি 'কুশান গান', 'বিষহরির গান', 'পদ্মাপুরাণ গান', 'পালাটিয়া'সহ উত্তরবঙ্গের নানা নাট্য আঙ্গিকের বিশেষ শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য। এতদ্অঞ্চলের পরিবেশনাগুলোতে সাধারণত চারিদিক ঘিরে থাকেন দর্শক তথা সাধারণ সামাজিকগণ। পরিবেশ্য আসরের মাঝখানে অবস্থান করেন বাদ্যযন্ত্রীরা আর মূলগায়েন বা 'গীদাল' যন্ত্রীদলের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে কাহিনির বয়ান করেন। এ যেন বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনে দেখা কৃষকের এক বা একাধিক গরুগুলোকে মাঝখানে একটি খুটির সঙ্গে বেঁধে চতুর্দিকে ঘুরিয়ে ধান মারাই করবার একটি সাধারণ দৃশ্য। তাই বলা যায়, পরিবেশনায় ব্যবহৃত 'মারাখচা'-রীতিটি উত্তরবঙ্গের মানুষের গ্রামীণ জীবনের প্রাত্যহিকতা থেকে উঠে আসা একটি সাধারণ চলনভঙ্গিমা মাত্র।

এই উভয় প্রকারের গান-এর পরিবেশনা সাধারণত বাড়ির বাইরের উঠান, মন্দির প্রাঙ্গণ বা যে কোন খোলা জায়গায় চারিদিকে বাঁশের খুটি দিয়ে সামিয়ানা টানিয়ে হতে দেখা যায়। উত্তরবঙ্গের

গ্রামগুলোতে বাড়ির গঠন বৈশিষ্ট্যে বাংলাদেশের অন্যান্য জেলাগুলোর তুলনায় কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এতদ্অঞ্চলে বাড়ির ঘরগুলো সাধারণত চারিদিকে ঘিরে তৈরি করা হয়। ফলে বাড়ির ঘরগুলোর মাঝখানে একটি আঙ্গিনা এবং বাড়ির বাইরের দিকে প্রশস্ত একটি উঠান থাকে। বাইরের উঠানকে আঞ্চলিকভাবে 'খুলি' (খোলা বাড়ি বা খোলা জায়গা অর্থে) বলা হয়। সাধারণত আয়োজকের বাড়ির বাইরের উঠানে বা 'খুলি'তে সামর্থ অনুয়ায়ী ধানের খর, টিন বা ইট দ্বারা একটি ছোট ঘর তৈরি করে তাতে মনসার ঘট বা মুর্তি স্থাপন করে মন্দির ঘর নির্মাণ করা হয়। এই 'খুলি'তেই মন্দিরের পাশে পদ্মাপুরাণ গান বা কান্দনী বিষহরির গান-এর বেশিরভাগ পরিবেশনাগুলো হয় বলে ক্ষেত্রসমীক্ষণে জানা যায়। সাধারণত সন্ধ্যার পর খোলা জায়গায় পূর্বে হ্যাজাকের আলোতে পরিবেশনা হলেও অর্বাচীনকালে এলইডি বাল্ব ও টিউব লাইটের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

এতদ্অঞ্চলের 'পদ্মাপুরাণ গান' ও 'কান্দনী বিষহরির গান'-এর দলে নারী অভিনেতার অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়নি। কাহিনি মধ্যে বিভিন্ন নারী চরিত্রে সাধারণত পুরুষ অভিনেতারই অংশগ্রহণ করেন। পরিবেশনায় যিনি মূল গায়েন থাকেন তাকে আঞ্চলিকভাবে 'গীদাল' বলা হয়। গীদাল সাধরণত ধুতি এবং পাঞ্জাবি পরেন আর মঞ্চোপকরণ হিসাবে গীদালের হাতে থাকে একটি চামর। গীদাল-এর একজন সহযোগী অভিনেতা থাকেন, তাকে 'দোয়াড়ি' বলা হয়। এই দোয়াড়ি ঐতিহ্যবাহী অন্যান্য নাট্য আঙ্গিকের মতো (যেমন গাজির গান-এ ঠ্যাটা, পালাগান-এ ডাইনা) গীদালের পরিবেশনায় সরাসরি কথোপকথন, গীত, নৃত্য ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। তিনি গীদালের সহযোগী হিসাবে নানা চরিত্রের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া দোয়াড়ি কাহিনির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বা সম্পর্কহীন নানা হাস্যরসাত্মক বিষয়ের অবতারণা করেন, ফলে দর্শক মধ্যে হাসির রোল পড়ে যায়। দোয়াড়ি সাধারণত সাদা ধুতি এবং সাদা গোল গলা গেঞ্জি পোশাক হিসাবে ব্যবহার করেন। এ ধরনের গানের দলে প্রয়োজনানুসারে ৪ থেকে ৬ জনের একটি ছুকরির দল থাকে। এই ছুকরিরা পরিবেশনায় মূলত নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন, পাশাপাশি তাদেরকে চরিত্র হিসাবেও অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। পরিবেশনায় সনকা, বেহুলা, মনসা, নেতা, রনি, রুশা ইত্যাদি চরিত্রের অভিনয়ে সাধারণত ছুকরিরাই অংশগ্রহণ করেন। ছুকরিরা বিভিন্ন উজ্জ্বল রঙের শাড়ি পরিধান করেন। মূল গীদাল ও দোয়াড়ি সাধারণত রূপসজ্জা করেন না কিন্তু ছুকরিরা নারীর বেশ গ্রহণ করবার সাথে সাথে বিভিন্ন রংঙের জিংক অক্সাইড, পাউডার, লিপস্টিক, টিপ ও কাজল ব্যবহার করে রূপসজ্জা করে থাকেন। পরিবেশনায় গানের তালে নৃত্যভঙ্গিমায় তৎপর হয়ে ওঠেন গীদাল, দোয়াড়ি আর ছুকরিগণ। 'পদ্মাপুরাণ গান' ও 'কান্দনী বিষহরির গান'-এ বাদ্যযন্ত্রীদের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে 'মারাখচা' রীতিতে দোয়াড়ির বা ছুকরিদের নৃত্যভঙ্গিমা সংশ্লিষ্ট জনপদের গ্রামীণ জীবন থেকে সহজাত প্রেরণায় উদ্ভূত ও অনায়াসে প্রযুক্ত বলে প্রতিভাত হয়।

উভয় প্রকারের গানের পরিবেশনায় হারমোনিয়া, খোল ও করতাল মূল বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ক্রিয়াশীল বলে ক্ষেত্র সমীক্ষণে দৃষ্ট হয়েছে। হারমোনিয়াম বাদককে কেন্দ্র করে খোল, জুরি, কর্নেড, ঝাঝর, নূপুর ইত্যাদি নিয়ে পরিবেশনার বাদ্যযন্ত্রীদল গঠিত হয়। এই বাদ্যযন্ত্রী দল থেকে কেউ কেউ আবার বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয় করে থাকেন বলে দৃষ্ট হয়েছে। তিনি নির্দিষ্ট চরিত্রের অভিনয় শেষে পূনরায় বাদ্যযন্ত্রীদলে আসন গ্রহণ করেন।

হিন্দু পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে ও হিন্দু সম্প্রদায়ের দেবী মনসার পূজা-অর্চণার নিমিত্তে পদ্মপুরাণ গান ও কান্দনী বিষহরির গান পরিবেশিত হলেও এই দলেগুলোতে হিন্দু সম্প্রদায়ের অভিনেতার পাশাপাশি মুসলমান সম্প্রদায়ের অভিনেতারাও অংশগ্রহণ করেন। গীদাল উত্তম কুমার-এর দলে মুসলমান ধর্মাবলম্বী দোয়াড়ি আয়নাল হক, হামোনিয়াম মাস্টার ফুল বাবু, কর্নেড বাদক জমশের আলি, ছুকরি আনোয়ারুল ইসলাম, সাইফুল এবং রানা পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করেন বলে ক্ষেত্র সমীক্ষণে দৃষ্ট হয়। অধিকন্তু পালার বন্দনা অংশে হিন্দু মুসলমান সকল দর্শককে বন্দনা করেই গীদাল

পালা শুরু করেন। গবেষকের তথ্যানুসারে কারবালার ময়দানে মুসলমানদের প্রিয় নবীর দৌহিত্র ইমাম হাসান-ইমাম হোসেনের শহীদ হবার মর্মান্তিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে মহররম মাসে উত্তরবঙ্গের কুড়িগ্রাম জেলায় মুসলমানদের পাশাপাশি সনাতন হিন্দুদের দ্বারা ‘জারি গান’-এর পরিবেশনা দেখা যায় (জাকারিয়া, ২০০৮: ৩)।

বলা যায়, এদেশে ইসলাম তার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং নানা পির-দরবেশের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ইসলাম ‘আঞ্চলিক সত্তা’র আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে এতদ্অঞ্চলে বহু পূর্বকাল থেকেই গান-বাজনারসহ নানা লোক পরিবেশনাগুলোকে আপন জঠরে লালন-পালন করেছে। দেশজ বোধবিশ্বাস ও লোক ধর্মের চর্চার কারণে এই ভূ-খণ্ড লোক পরিবেশনাগুলোর বিকাশে কোথাও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি, কেননা সুদীর্ঘকাল এতদ্অঞ্চলের বসবাসরত মানুষের মাঝে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরাজ করছিল। দরিদ্র সামাজিকগণ আপন রোগ-শোক-জরায় আশ্রয় খুঁজেছে কাঙ্ক্ষিত লৌকিক দেব-দেবী, মনসা, চণ্ডী, গাজি পির, খোয়াজ খিজিরের মতো অতিলৌকিক শক্তির কাছে। কিন্তু ব্রিটিশ শাসকবর্গ ভারতবর্ষে তাদের শাসনকে চিরস্থায়ী করবার লক্ষ্যে হিন্দু-মুসলিম প্রতিক্রিয়াশীলদের উসকে দিতে ‘ডিভাইড অ্যান্ড রুল’ নীতি চালু করে। ফলাফলস্বরূপ ‘বঙ্গভঙ্গ’, ‘বঙ্গভঙ্গ বাতিল’, এবং ১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতিতত্ত্ব বা ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত হয় ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৫ সাল পরবর্তী সময় থেকে অদ্যাবধি নানা রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে সাম্প্রদায়িক চেতনার কট্টর মৌলবাদী শক্তির কর্মকাণ্ড পুনরায় মাথা চারা দেয়। এমত্বস্থায় বিভিন্ন ধর্ম গোষ্ঠীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও তলানিতে গিয়ে ঠেকে। একইভাবে সারাদেশে প্রাপ্ত নানা ঐতিহ্যবাহী আঙ্গিকের পরিবেশনার ক্ষেত্রেও এই অস্থিরতার প্রভাব কিছুটা হলেও লক্ষ করা গেছে। এসব কিছু সত্ত্বেও উত্তরবঙ্গের সামাজিকগণের মাঝে ঐতিহ্যবাহী এই পরিবেশনাগুলোতে অভিনেতা এবং দর্শক উভয় ভূমিকায় হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত অংশগ্রহণ উল্লেখ করবার মতো। সাইমন জাকারিয়ার মতে,

> যে কোন ধর্মকেন্দ্রিক নাট্যই হোক না কেন তা এখানকার জলবায়ুতেই পুষ্টিলাভ করে এদেশের মানুষের রসচেতনার সঙ্গে ঐক্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। সম্ভবত এ কারণেই দেখা যায় কোন একটি ধর্মমত নির্ভর পরিবেশনা অন্য ধর্মমতের মানুষ কর্তৃক অবলীলায় অভিনিত হয়ে থাকে (জাকারিয়া, ২০০৮: ৩)।

বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলে মনসার পূজা হলেও বাংলাদেশের বাইরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে কোচবিহার এবং আসামে অনেক মন্দিরে বিধিপূর্বক মনসার পূজা হয় বলে জানা যায়। বলা যায়, মূলত বাংলা ভাষাভাষি অঞ্চলেই মনসার পূজা সর্বাধিক জনপ্রিয়। বর্ষাকালে সাপের উপদ্রব বৃদ্ধি পেলে মহাসমারোহে এই পূজাগুলো হয়ে থাকে। আহমদ শরিফের মতে, “মনসাকে অন্যদেশে ও ভিন্ন সমাজে সন্ধান করা নিরর্থক। জীবন-প্রতিবেশ থেকেই প্রাণের নিরাপত্তার প্রয়োজনে স্বদেশেই মনসার উদ্ভব” (শরীফ, ২০০৮: ২৬৪)। বৈশাখ থেকে শ্রাবণ পর্যন্ত মনসা পূজার বিধান থাকলেও এতদ্অঞ্চলে শ্রাবণ মাসেই গীতবাদ্য সহযোগে রজনী জাগরণে মহাড়ম্বরে মনসার পূজা ও স্তুতি গান হয়ে থাকে। হিন্দু পঞ্জিকা অনুসারে শ্রাবণ মাসের (জুলাই-আগস্ট) নাগপঞ্চমি তিথি, শ্রাবণ সংক্রান্তি, ডাক সংক্রান্তি ইত্যাদি সময়ে নানা বিধিপূর্বক প্রচলিত। তবে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণত শ্রাবণ মাসের পুরো সময় জুড়ে ‘মনসামঙ্গল’ পাঁচালি পরিবেশিত হতে দেখা যায়। শনি ও মঙ্গলবার সর্পকুলের উদ্দেশ্যে ভোগ দেওয়া এ পূজার অন্যতম কৃত্য।

নিম্নবর্গীয় হিন্দুদের কাছে মনসা একজন গুরুত্বপূর্ণ প্রজনন দেবতা হিসাবে স্বীকৃত। তবে বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে রাজবংশী সম্প্রদায়ের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দেবদেবীদের অন্যতম হলেন মনসা। প্রায় প্রত্যেক কৃষক গৃহে মনসার ‘থান’ বা বেদী পাওয়া যায়। দিনাজপুরের কিছু কিছু

জায়গায় দুর্গাপূজার পরিবর্তে মনসার পূজা হয় বলে জানা যায়। গবেষক ধারণা করেন, এসব অঞ্চলে ৩০০ বছরের বেশি সময় ধরে এ পূজার প্রচলন রয়েছে (প্রবেশ ২৪ জুন ২০২২)।

সংশ্লিষ্ট সমাজ-মানুষের ভূমিরূপের অভিব্যক্তি

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, উত্তরবঙ্গ তথা এতদ্‌অঞ্চলের সনাতন-হিন্দু রাজবংশী সম্প্রদায়ের সাধারণ সামাজিকগণ বিভিন্ন মানত উপলক্ষ্যে দেবী মনসার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য 'পদ্মাপুরাণ গান' ও 'কান্দনী বিষহরির গান'-এর আয়োজন করে থাকেন। এটি সনাতন হিন্দু দেবীর মাহাত্ম্যমূলক পরিবেশনা হলেও উভয় গানের দলে যেমন হিন্দু-মুসলমান অভিনেতার উপস্থিতি রয়েছে তেমনিভাবে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মুসলমান সম্প্রদায়ও দর্শক হিসাবে সাধারণ সামাজিকগণের কাতারে অবস্থান করে পরিবেশনার রস আস্বাদন করেন বলে ক্ষেত্র সমীক্ষণে দৃষ্ট হয়েছে। পরিবেশনাগুলোর প্রতি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ সমাজের সাধারণ মানুষের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ঘাটন জরুরি, তবেই সংশ্লিষ্ট সমাজের মানুষের ভূমিরূপের অভিব্যক্তি নির্ণয় সম্ভব হবে বলে ধারণা করা যায়। এই পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মনসা বিষয়ক পরিবেশনায় অভিনেতা, দর্শক, আয়োজনসহ সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার হতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশিত হলো-

ব্যক্তিগত জীবনে কাঠমিস্ত্রির পেশায় নিযুক্ত অভিনেতা আনোয়ারুল ইসলাম ১০ বছর বয়স থেকেই 'পদ্মাপুরাণ গান'-এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন বলে জানান। এ প্রসঙ্গে ক্ষেত্র সমীক্ষণে প্রাপ্ত পদ্মাপুরাণ গান-এর দলের ছুকরি, সনকা চরিত্রের অভিনেতা আনোয়ারুল ইসলাম-এর ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে পদ্মপুরাণ গানের পরিবেশনায় দর্শক হিসাবে মুসলমানদের প্রভূত উপস্থিতি ও গানের আয়োজন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। অভিনেতা আনোয়ারুল জানান,

> আমাদের (মুসলমানদের) মধ্যে করে না কিন্তু ভুল-ভবিষ্যৎ যারা বিপদে পরে তারা আয়োজন করে। যেমন সেদিনকা সাপ্টিবাড়িত (লালমনিরহাট সদর থানার সাপ্টিবাড়ি ইউনিয়ন) এক মুসলমানের বাড়িতে গান গাইলাম। হাজীর বাড়িত, সে কিন্তু হাজী। ওনার বাড়িতে গান গাইলাম, উনি অনেক বিপদের মধ্যে... মানে... অনেক ফকির-ফাকরা দিয়া ঝারাঝুরা করছে। যেমন উনি ঝারা-ঝুরা করছে, প্যারালাইসিস রোগী...মানে বাঁচে না। কোন এক লোক গান দিতে বলছে, এই কারণে গান করছে। (সাক্ষাৎকারঃ আনোয়ারুল ইসলাম, লালমনিরহাট, ১৯ সেপ্টেম্বর-২০২১)

মুসলমান আয়োজক সম্পর্কে আনোয়ারুল জানান, "যারা বিপদে পরে তারা আয়োজন করে"। ধারণা করা যায়, নানা রোগ-শোক-বিপদে এতদ্‌অঞ্চলের সাধারণ সামাজিকগণ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এই পালার আয়োজন করে থাকেন। বলা যায়, ধর্ম অতিক্রান্ত একটি সামষ্টিক বোধ-বিশ্বাস থেকে সামাজিকগণ (হাজী হওয়া সত্ত্বেও) এই পরিবেশনার আয়োজক হন। দেখা যাচ্ছে, 'পদ্মপুরাণ গান'-এর পরিবেশনায় শুধুমাত্র শিল্পী হিসাবে অংশগ্রহণ নয়, বরং এতদঅঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান সামাজিকগণ দর্শক-আয়োজক হিসাবে পরিবেশনা স্থলে উপস্থিত হয়ে রস আস্বাদনের ক্ষেত্রে উভয়ই একই প্রেরণা-ধারায় স্নাত হন। প্রাসঙ্গিক বিচারে উক্তদিনের পরিবেশনার সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অংশগ্রহণকারী দর্শক শাহেদ আলী জানান,

> এই তো এই পূজারে জন্য দেয়। এটা মানতি, মনে করো কেউ কিছু মানসা করছে। মানে একটা অসুখ-বিসুখ হইল বা যা কোন হইল, যে কোন একটা হঠাৎ মানে মনে করো যে একটা মানতি করলো..আল্লার রহমতে সে ভালো হয়া যায়। [...] মানসা হেন্দুদের.... মুসলমানও মানসা করে। আমার যে একটা মাঠ আছে [...] নামাজ পড়ি [...] ওখানে যে ওমরা (হিন্দুরা) মানতি নেয়। মনে করো টাকা পয়সা ওখানে দেয়। (সাক্ষাৎকারঃ শাহেদ আলী, লালমনিরহাট, ১৭ সেপ্টেম্বর-২০২১)

শাহেদ আলী'র উপরিউক্ত সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, "মুসলমান তো থাকবেই" অর্থাৎ যাপিত জীবনে যে মানুষগুলোর সঙ্গে উঠাবসা, হাসি-আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয়া যায়, সেরকম আত্মিক বন্ধনে জড়িত বাড়ির পাশের উঠানে উপস্থাপিত পরিবেশনায় মুসলমানরা তো থাকবেই। হোক সে ভিন্ন ধর্মের, ভিন্ন আরাধ্যের পূজারী। পাশাপাশি তিনি এও বিশ্বাস করেন যে, অসুখ-বিসুখে হিন্দু দেবীর কাছে মানত করে কিছু চাইলে আল্লাহর রহমতে সে সুস্থ হয়ে যায়। তাই হিন্দু সম্প্রদায় যেমন মানত করে মসজিদে, পিরের দরগায় টাকা-পয়সা দেন একইভাবে মুসলমানরাও হিন্দুদের পূজা-পার্বণে সাধ্যময় আর্থিক সাহায্য করেন বলে সাক্ষাৎকারে জানা যায়। গবেষকের প্রশ্নের জবাবে হিন্দু ধর্মাবলম্বী দিনা রাণী জানান,

> এই যে এখনই আমি দিয়া আইসলাম। এই যে ভুরার (কলাগাছ দিয়ে বানানো ভেলা) জল নিছি। ৫ কেজি চাউল, ১০০ টাকা মানতি ছিল-এখন দিলাম। ফরিদপুরের আটরশি পিরের ভেলায় দিলাম। এইটার কাহিনি হইলো, আমার একনা নাতি আইসছে আরবার (গত বছরে)। সবারে পাচত (সবার পরে) ওয়ায় আইসছে। কইছে রে, খাজা বাবা ঠাকুর, আমার পেটে যদি একজন ছেলে সন্তান দেয়, তাইলে আগামী বৎসর আমি ৫ কেজি চাল, ১০০ টাকা দেমো (দেব)- মানতি করছে। এখন তো ছেলে সন্তান হয়া গেইছে। এখন তো দেওয়া লাইগবে। (সাক্ষাৎকারঃ দীনা রাণী, লালমনিরহাট, ১৮ সেপ্টেম্বর-২০২১)

আয়োজনে আর্থিক সাহায্য কিংবা পরিবেশনা চলাকালীন সময়ে গীদালের 'ফেরি' করবার সময়ও মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ হিন্দু-মুসলমানের প্রতিষ্ঠানিক ধর্ম অতিক্রান্ত সামষ্টিক বোধ বিশ্বাসজাত এক মানবিক প্রেরণা থেকেই সাধারণ সামাজিকগণ এই পরিবেশনার সাথে সম্পৃক্ত হন বলে ধারণা করা যায়। পরিবেশ্য কাহিনির চরিত্রগুলোর সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে নিজেকে আবিষ্কার করে চাঁদ বা বেহুলার দুঃখে কাতর হন। পাশাপাশি আপ্লুত হন মনসার প্রতি ভয়মিশ্রিত ভক্তিতে, দেবীর ভয়ঙ্কর-বিশাল ক্ষমতার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে। এ প্রসঙ্গে গবেষক ইউসুফ হাসান অর্ক-এর মতামত নিম্নরূপ,

> এদেশের সাধারণ মানুষের ধর্মচেতনা এর আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক চেতনার গভীরে প্রথিত। সেই চেতনার ক্রিয়াশীলতার কারণে এই দেশের মুসলিম দর্শকের চেতনায় হিন্দু চরিত্রের কাহিনিকে 'নিজের' বলে ভাবতে কোনো অসুবিধা হয় না। শুধু পালাগান নয়, রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনি পরিবেশনকেও এই অঞ্চলের মানুষ দেশজ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে নিজের অবচেতনে লালন করে থাকে বলে রামায়ণ গান, কালী কাচ ইত্যাদি ঐতিহ্যবাহী কৃত্যমূলক নাট্যে মুসলমান দর্শকের সমাগম ঘটে বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে (হাসান, ২০১৮: ২২৬)।

পূজালোভী দেবী মনসা যে কোন মূল্যে পূজা চান, চান নিজ মাহাত্ম্যের প্রচার। মঙ্গলকাব্যে মনসা নিজ স্বীকৃতি আদায়ে বিভিন্ন কলাকৌশল-ক্রুরতা-শঠতা-ছলনা-হীনতা সর্বোপরি নিজ মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠান জন্য চাঁদ সওদাগরকে চরম নিগ্রহদান করেন। মনসার প্রতিশোধ পরায়ণতা ও চারিত্রিক দীনতা দর্শক-পাঠককে চাঁদ সওদাগর, সনকা, বেহুলা এমন কি মৃত লক্ষীন্দরের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলে ঠিকই কিন্তু অন্যদিকে, সাধারণ সামাজিকগণ প্রাণ হন্তকারক দেবী মনসাকে ভয়-মিশ্রিত শ্রদ্ধা-ভক্তি করে আপনার ও আত্মীয়ের প্রাণ রক্ষার্থে পূজা-অর্চনার আয়োজন করেন। উত্তরবঙ্গের গ্রামগুলোতে সাধারণ সামাজিকগণ শুধু পূজা-অর্চনায় ক্ষান্ত হননা। তারা পূজার সাথে সাথে মনসা বিষয়ক পরিবেশনা করতে বাধ্য হন। প্রাসঙ্গিকতার বিচারে সংশ্লিষ্ট সমাজে বসবাসকারী কৃষক, ২৯ বছর যাবৎ

মনসা বিষয়ক 'পদ্মাপুরাণ গান'-এর আয়োজক এবং উক্ত পালায় দর্শক হিসাবে আগত শ্রী অতুল চন্দ্র ভক্ত-এর মতামত নিম্নরূপ,

> ক্ষতি হয়। আমি একবার ঘর তুলবার চিন্তা-ভাবনা করছিলাম। সেইবারে আমার একটা কিডনি পঁচে ফেলাইছে। আমি বর্তমানে একটা কিডনির ব্যাপারে আছি। বলছিলাম যে, এরাবে পূজা করবো ঠিকে কিন্তু গান করাইতে পারবো না। তারপরে সংসারে অবনতি ছিল। মন্দিরটাও পাকা করছিলাম সেইবারে, আবার মেয়ের বিয়াও সেইবারে ঠিক করছিলাম। যার কারণে অনেক টাকা-পয়সার ব্যবধান ছিল। এই কারণে আমার একটা দীর্ঘ ক্ষতি হয়া গেইছে। [..] রাগী মানে খুব তেজী। ভক্ত কথা না শুনলেই এ্যাটাক করি ফালাইবে। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ এ আছে। আমাদের মন্দিরে সর্প দেখা দেয়। [..] মনসা কিন্তু কাকো ছাড় দেয় না। অন্য জাতিকেও ছাড় দেয় না। যার কারণে কিছু কিছু লোক মানে। না মানিয়া তো আর পারে না। এমনও কারো প্রত্যক্ষ প্রমাণ- (সাপ) ঘরে দেখা দিল, বিছানায় দেখা দিল বা রাস্তায় এ্যাটাক করলো। এগুলা হয়। (সাক্ষাৎকার: অতুল চন্দ্র, লালমনিরহাট, ১৮ সেপ্টেম্বর-২০২১)

উক্ত 'পদ্মাপুরাণ গান'-এর আয়োজক শ্রীমতি ইন্দিরা রাণী'র কন্যা কৃষ্ণা রাণীর সাক্ষাৎকারের চুম্বক অংশ সন্নিবেশিত হলো-

গবেষক : আমি জানতে চাচ্ছি, পদ্মাপুরাণ গান কেন করে মানুষ? এ বিষয়ে বলেন।

কৃষ্ণা রাণী : কেন করে বলতে, আমার জানা মতে আমি ছোটবেলায় অন্ধ ছিলাম। আমি অন্ধ ছিলাম, আমার তো চোখ খোলে না। [..] পরে আমার পূজা দিয়া আমার চোখ খুলছিল (দেখতে পেয়েছিলেন)। চোখ খোলার পর থাকি বাবা আরকি এই পূজা-গান ছাড়ে না (বাদ দেয় না)।

গবেষক : জন্মের পরে থেকেই কি আপনি চোখে দেখতেন না?

কৃষ্ণা রাণী : না, জন্মের পরে আমি ভালো ছিলাম। তখন আমার বয়স কত... বড় ছিলাম, এই এইটুক ছিলাম (হাত দিয়ে উচ্চতা মেপে দেখান কৃষ্ণা), তারপরে আমার চোখ কানা হইলো। আমি আর দেখতে পারি না। ফকফকা দেখি না, একটা দেখি তো আর একটা দেখি না। আমার অবশ্য অত কিছু মনে নাই। পরে এই পূজা আর গান দেওয়ার পর ভালো হইলাম। পূজা-গান এইগলা দেওয়ার পর আমার চোখ খুললো। (সাক্ষাৎকার: কৃষ্ণা রাণী, লালমনিরহাট, ১৯ সেপ্টেম্বর-২০২১)

অতুল চন্দ্র ভক্তের উপরিউক্ত সাক্ষাৎকারে জানা যায়, 'পদ্মাপুরাণ গান' বাদ দিয়ে শুধু পূজা করবার বাসনা ব্যাক্ত করেছিলেন বিধায় দেবী মনসা তার একটি কিডনি নষ্ট করে দিয়েছেন। তার ভাষায়, "সেইবারে আমার একটা কিডনি পঁচে ফেলাইছে"। বর্তমানে একটি কিডনির সাহায্যে তার শরীরবৃত্তিও কাজ চলছে। ক্ষুব্ধ দেবী মনসা যেন অবশিষ্ট কিডনিটাও নষ্ট করে না দেন সেজন্য শত অভাব-অনটন সত্ত্বেও তিনি পরবর্তীসময়ে 'পদ্মাপুরাণ গান'-এর আয়োজন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অতুল চন্দ্র বিশ্বাস করেন 'দেবী খুব তেজী'। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে দেবীর কথা শুনতেই হবে। তাছাড়া ভক্তকে সাবধান করবার জন্য তিনি সাপরূপে কখনও ঘরে, কখনও মন্দিরে দেখাও দেন। অন্যদিকে মনসা কৃষ্ণা রাণীকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন। কৃষ্ণার মা অর্থাৎ ইন্দিরা রাণী'র উপর ভর করে মনসা করণীয় বলে দিয়েছিলেন। সে অনুযায়ী মনসার পূজা ও পদ্মাপুরাণ গান-এর আয়োজন করে কৃষ্ণা পূনরায় চোখের দৃষ্টি ফিরে পান। তাহলে দেখা যাচ্ছে, দেবী মনসা মর্তের মানুষের পূজা-অর্চণা ও তার গুণগান ও মাহাত্ম্য প্রকাশক 'পদ্মাপূরাণ গান'ই তার চাই, অন্যথায় সম্মুখ বিপদ। সেজন্যই হয়তো মনসাকে গবেষকের ভাষায় 'সাপের মতো দূজ্ঞেয় চরিত্রের অসূয়াপরায়ণা কোপনস্বভাবা নারীপ্রতিক'-এ কল্পনা করা হয়েছে। সমগ্র পৃথিবীর প্রায় সব সমাজেই এবং ভাষায় হিংসা- ক্রোধ, প্রতিশোধ,

বিশ্বাসঘাতকতা, ছদ্মবেশ, কৃতঘ্নতা, পীড়ন-পেষণ, আষ্টে-পৃষ্ঠে বন্ধন প্রভৃতি উপমা হয়ে রয়েছে সাপ। তাই নিশ্চিত মৃত্যুর প্রতীক সাপকে আদিম কোন সমাজ অস্বীকার বা অবহেলা করতে পারে নাই। তাইতো কেউ মন্ত্রে, কেউ পূজায়, কেউবা বাহু বলে, কেউ ভেষজে-ঝাড়ফুঁক-তুকতাক প্রভৃতি সাধনায় সাপকে বশ করতে চেয়েছে নিজের প্রাণের নিরাপত্তার প্রয়োজনে। উষ্ণদেশে 'সাপ' সর্বক্ষণের শঙ্কার কারণ আর সে জন্যই হয়তো ওঝা ও সাপুড়ে বৃত্তির লোকও পৃথিবীর সব অঞ্চলেই কম-বেশি পাওয়া যায়। বাংলাদেশে ওঝা ও সাপুড়ের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামগুলোতে মনসার 'ভরাক্রান্ত' অবস্থায় অনেকেই নানা জটিল রোগের কারণ-চিকিৎসা-সমাধান ও ভক্তের করণীয় আদেশ-নিষেধ প্রদান করে থাকেন। অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত (প্রাতিষ্ঠনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নয় অর্থে) সাধারণ সামাজিকগণের ভক্তি-বিশ্বাস ও সারল্যের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে এই লোকচিকিৎসাগুলো লালমনিরহাট জেলা তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গের গ্রামগুলোতে বিরাজমান বলে ক্ষেত্র-সমীক্ষণে জানা গেছে।

একইভাবে চিকিৎসাপ্রার্থী হিসাবে মহিধর, সিনাই ইউনিয়ন, রাজারহাট উপজেলা, কুড়িগ্রাম জেলার অধিবাসী পশু চিকিৎসক পরেন্দ্রনাথ রায়-এর বাড়িতে মনসার পূজা-অর্চণা, ঘট স্থাপন ও পদ্মাপুরাণ গানের আয়োজন হয়। পরেন্দ্রনাথ রায় তার সাক্ষাৎকারে জানান,

> চুনের যে খুটি (ছোট ঘড়া বা কৌটা বিশেষ)-এটা হাত থাকি পড়ি যায়া মাটিতে পড়ছে। পড়ি, চুন চটকি (ছিটে এসে) আমার স্ত্রীর চোখের মধ্যে পড়ছে, ডান চোখে। ৭ দিন, ১৪ দিন, ২১ দিন- এভাবে দুই মাস যাওয়ার পরও কোন সুস্থ হচ্ছেন না। [...] তা ঐ বৎসরেই তার গায়ে ঠাকুর হাজির হতো এবং সেখানে ভর করতো। পরে শুধু তার কাছে ওয়াদা নিছে যে, বাড়িতে গিয়া ঠাকুরক থান দিয়া (স্থান দিয়ে) পূজা করতে হবে। যদি এইটা করো, তাহলে চোখ ভালো হইবে। তো এখন ঠাকুরের যে অসীম দয়া এটা আমরা বুঝি না, তার লীলা বুঝি না। যাই হোক, তারা দুইজনে কথা দিছে। দেওয়ার পর, চোখ আরাম হয়া গেইছে। যে সমস্ত ঔষধ কাজ করেনি বাড়িতে ছিল, সেখান থাকি পরামর্শ দিছে যে ঐ ঔষধগুলান ব্যবহার করলে ভালো হবে। যাই হোক এখানেই অনেকটা সুস্থ, এই ৮/১০ দিন হলো অসুখ থাকি সুস্থ হয়া গেছে। তো এখন বাড়িতে আমাকে বাধ্য হয়া ঠাকুরকে স্থাপন করা লাগলো। (সাক্ষাৎকার: পরেন্দ্রনাথ রায়, লালমনিরহাট, ১৯ সেপ্টেম্বর-২০২১)

যেহেতু পরেন্দ্রনাথ রায় একজন পশু চিকিৎসক, সেহেতু আমরা ধারণা করে নিতে পারি তিনি বিজ্ঞান জানেন, বা বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। তার ভাষ্যমতে, "এখন বাড়িতে আমাকে বাধ্য হয়া ঠাকুরকে স্থাপন করা লাগলো"। অর্থাৎ স্ত্রীর চোখের চিকিৎসার কারণে তিনি ইন্দিরা রাণী তথা প্রতিহিংসাপরায়ণ দেবী মনসার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দেবীর প্রতি অবহেলা-অকৃতজ্ঞতা প্রকাশে তিনি চাঁদ সওদাগরের পরিনতি চান না। তাই সম্মুখ বিপদ আশঙ্কায় তিনি মনসাকে নিজ বাড়িতে স্থাপন করেন, আয়োজন করেন 'পদ্মাপুরাণ গান'। আবার চিকিৎসা শাস্ত্রের মানুষ হয়েও তিনি বিশ্বাস করেন যে, অশিক্ষিত (লেখাপড়া জানেন না) ইন্দিরা রাণী নিজে চিকিৎসক নন কিন্তু কারো দ্বারা বা কোন আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা তিনি এই চিকিৎসা করান। তাহলে বলা যায়, কৃতজ্ঞতা-বিশ্বাস পাশাপাশি আত্মজের জন্য শঙ্কা ইত্যাদি তাকে 'পদ্মাপুরাণ গান' আয়োজক করে। এতদ্প্রসঙ্গে অন্য আর একটি উদাহরণ পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। গ্রাম: ছাটহর নারায়ণ (আমের তল), ইউনিয়ন: বড়বাড়ি, লালমনিরহাট সদর নিবাসী দিনা রাণী'র সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, তিনি এ পর্যন্ত ৮ থেকে ৯ বার পদ্মাপূরাণ গান-এর আয়োজন করেছেন। দিনা রাণী'র সাক্ষাৎকার সংযুক্ত হলো,

> আমি একসময় যে মানুষের বাড়িতে ছিলাম। একদিন কথায় কথায় কাজিয়া (ঝগড়া) লাগছে, আমার একটা আকা (চুলা) ভাঙ্গি দিছে ঐ বাড়িয়ালায়। তখন আমি মনসা... ঐ যে বাবা জোস্না গীদালী আছে না? অই গেরাম আইসছে। ওক কছি যে, মাওয়াই,

> মনসা যদি মোর ছাওয়ার জন্য পাঁচ শতক মাটি নিয়া দিত তাইলে আমি মনের আনন্দে পূজা-আর্চনা বা মনসা গান দিলাম হয়। এই কথা কইছে। এক বৎসর নাই হইতে আমি রাস্তার ধারে পাঁচ কাঠা মাটি এমনকি জমিয়ালা টাকা নাই নিয়া এস্টারি (রেজিস্ট্রি) করি দিছে। এক বৎসরে তাক (তাঁকে) টাকা দিছি। সেই হাতে (হতে) আমাদের বাড়িত অনুষ্ঠান চলছে। (সাক্ষাৎকার: দিনা রাণী, লালমনিরহাট, ১৮ সেপ্টেম্বর-২০২১)

উপরিউক্ত সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, দিনা রাণী বাড়ি করবার জন্য ৫ শতক জমি কিনতে পারলে তিনি মনসার পূজা এবং মনসার গান দেবেন বলে মানত করেছিলেন। দেবীর কাছে মানত পরিপূর্ণ করতে তিনি পদ্মাপুরাণ গান আয়োজন করেন। এখানে দীনা রাণীকে মনসার পক্ষে পরোক্ষ প্রচারক হিসাবে শনাক্ত করা যায়। তিনি এও বিশ্বাস করেন যে, দেবীর সঙ্গে বেয়াদবি করলে শারীরিক যে কোন ক্ষতিও হয়ে যেতে পারে। দিনা রাণী'র ভয় মিশ্রিত ভক্তি-বিশ্বাস তাকে পদ্মাপুরাণ গান-এর সাথে সংলগ্ন রেখেছে বললে অত্যুক্তি হবে না।

ইন্দিরা রাণীর এই লোকচিকিৎসা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষ করে উত্তর ইউরোপ ও মধ্য এশিয়া প্রচলিত 'শামান' বা 'শামানিজম (Shamanism)' ধারণার সমান্তরালে বিচার করা চলে। সাধারণভাবে এতটুকু বলা চলে যে, আদিম জনগোষ্ঠীর এই শামানগণ মানুষের চিকিৎসার্থে বা কল্যাণ কামনায় এই ধরনের ঝাড়-ফুঁক, তুক-তাক করে থাকেন। তান্ত্রিক বা পুরোহিতের মতো শামানগণ কোন আধ্যাত্মিক শক্তিকে ডেকে নিজ শরীরে নিয়ে আসেন এবং সেই আধ্যাত্মিক শক্তির মাধ্যমে অসুস্থ ব্যাক্তির সুস্থতা দান করেন। কিন্তু পদ্মাপুরাণ গান-এর আয়োজক-লোকচিকিৎসক ইন্দিরা রাণী মনসার ভর (আধ্যাত্মিক শক্তি) অবস্থায় চিকিৎসা করেন বিশেষ কিছুর শর্তে। দেবী মনসা ভক্তের কাছে পূজা, ফুল-জল-পুষ্প আর নিজের মাহাত্ম্য প্রকাশক গান চান। ইন্দিরা দেবী মনসার ইহলৌকিক প্রতিনিধি হিসাবে চিকিৎসা প্রার্থীদের মাঝে দেবীকে অভিপ্সিত পূজা প্রাপ্তির ব্যবস্থা করে দেন। ফলে মনসা দেবী ও তার মাহাত্ম্য ছড়িয়ে পড়ছে গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে। বিনিময়ে ভক্ত শুধু প্রাণ ভিক্ষা চান কেননা ভক্তের ত্রুটি হলে প্রাণ সংহারও অবাঞ্চিত নয়।

পূজাকাঙ্ক্ষী দেবী মনসার সন্তুষ্টি অর্জনে আসে জাগতিক সুখ, ভক্ত পেতে পারেন কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা। ধনে-জনে ভরে উঠতে পারে ভক্তের ঘর। যেমনটা হয়েছিল চাঁদ সওদাগর মনসাকে বাম হস্তে পূজা দেবার পর সওদাগরের ছয় পুত্রসহ বেহুলা-লক্ষীন্দরের প্রত্যাবর্তন, সপ্তডিঙ্গা ভর্তি মণি-মাণিক্য। কবি বিজয়গুপ্তের *পদ্মাপুরাণ*-এ বলা হয়েছে,

ইন্দ্রপুর হইতে দেবী রথ আনাইল।
হরষিত হইয়া চান্দ রথেতে চড়িল ॥
ছএ পুত্র ছএ বধু আপনারা দুইজন।
ইন্দ্ররথে চড়ি গেলা স্বর্গ ভুবন ॥

(দাসগুপ্ত, ২০০৯: ৫৪৪)

উপসংহার : একটি প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ

গবেষকগণ ইতোমধ্যে মনসা বিষয়ক ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্য 'পদ্মাপুরাণ গান' বা 'বিষহরির গান'-কে একটি কৃত্যমূলক নাট্য আঙ্গিক হিসাবে শনাক্ত করেছেন। ধারণা করা যায়, প্রাচীন সর্বপ্রাণবাদী কোচ-মেচ জাতিগোষ্ঠী, তাদের ধর্মান্তরকরণ, মাতৃতান্ত্রিক থেকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় প্রবেশ, ফেলে আসা কোচ জীবনধারার সংস্কার-বিশ্বাস-প্রথা, উত্তরবঙ্গের ভূমিরূপ, সর্বদা সাপের ভয়, রোগ-শোক-বিপদ, জাগতিক প্রাপ্তি ইত্যাদি নানা কারণে তারা লৌকিক দেবী মনসাতে আশ্রয় করতে বাধ্য হয়েছে।

একই কারণে বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে রাজবংশী জাতিগোষ্ঠীর কাছে মনসা গুরুত্বপূর্ণ দেবী হিসাবে প্রায় প্রত্যেক বাড়ির উঠানে স্থান পেয়েছে- এরূপ বললেও অত্যুক্তি হবে না।

পূজা লোভী-প্রতিশোধ পরায়ণা দেবী মনসাকে তুষ্ট করতে, কৃত্য পালন উদ্দেশ্যে এবং কৃত্যের আবহে এই নাট্য উত্তরবঙ্গের রাজবংশীসহ বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই বিভিন্ন নামে পরিবেশিত হয়ে থাকে। পরিবেশনায় উপস্থিত সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সামাজিকগণ একাধারে বেহুলা-লক্ষিন্দর, চাঁদ বণিকের বেদনায় যেমন কাতর হন, তেমনি কোপনস্বভাবা মনসাকে উলুধ্বনিতে স্বাগতও জানান। মনসার উদ্ধত ও তীব্র বাক্যবাণ কিংবা হিংসাত্মক আচরণ সামাজিকগণের মনে ভীতির সঞ্চার করে ক্ষমতাধরের বিরাট বিষধর শক্তি অসহায় দরিদ্র সামষ্টিকের সমীহ আদায় করে নেয় বলে ক্ষেত্র সমীক্ষণে দৃষ্ট হয়। এতদ্অঞ্চলের সাধারণ মানুষের আত্মপ্রত্যয়হীনতাকে শাসন ও শোষণ করেছে বহিঃশত্রু–তুর্ক, মুঘল, বৃটিশ। কিন্তু ঘরের ভিতরে যে বিষধর সাপ, তাকে স্তুতিতে-তোয়াজে-পূজায় বশ করে নিজ প্রাণের নিরাপত্তা কামনা করতে হয়েছে; একইভাবে গণেশ, মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতি শক্তিকে প্রমূর্ত করে মা-বাপ ডেকে নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছে। বলা যায়, শুধু জীবন ধারণের জন্য হলেও মনসা বিষয়ক নানা পরিবেশনার সাথে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মানুষ সঙ্গত কারণেই সংলগ্ন।

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা গ্রন্থ

১. অর্ক, ইউসুফ হাসান, (২০১৮) *বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্য 'পালাগান' আঙ্গিক বিচার ও বর্ণনাকারীর অবস্থান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১০০০।

২. আল দীন, সেলিম, (১৯৯৮) *বাঙলা নাট্যকোষ*, শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, ৪১ স্যার সৈয়দ আহমেদ রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

৩. আহমদ, ওয়াকিল, (২০০৯) *বাংলা লোকসংগীত: ভাওয়াইয়া*, লেখক সমবায়, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা, ১১০০।

৪. জাকারিয়া, সাইমন, (২০০৮) *বাংলাদেশের লোকনাটক বিষয় ও আঙ্গিক-বৈচিত্র্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১০০০।

৫. দাসগুপ্ত, শ্রী জয়ন্তকুমার, এম, এ (সম্পাদিত), (২০০৯) *কবি বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা।

৬. ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, (২০২০) *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২ বঙ্কিম চ্যার্টার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩।

৭. মজিদ, মুস্তফা, *রাজবংশী*, (২০২৩) জার্নিম্যান বুক্স, ১০/৬, ইস্টার্ন প্লাজা, সোনারগাঁও রোড, ঢাকা-১২০৫।

৮. রায়, নীহাররঞ্জন, (১৪০০) *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যার্টার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩।

৯. শরীফ, আহমদ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, ১ম খণ্ড, দি নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ৬৫ প্যারী দাস রোড, ঢাকা।

১০. সরকার, সুধীরচন্দ্র (সংকলিত), (১৪১৫) *পৌরাণিক অভিধান*, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩।

১১. হক, নাজমুল, (২০০৭) *উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্যের নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা*, বাংলা একাডেমি ঢাকা-১০০০।

ইংরেজি গ্রন্থ

১. Ahmed, Syed Jamil, (2000) *Acinpakhi Infinity Indigenous Theatre in Bangladesh,* The University Press Limited, 114 Motijheel C/A, Dhaka.

২. Tate, Karen, (2006) *Sacred Places of Goddess: 108 Destinations*, first edition, Published by the Consortium of Collective Consciousness Publishing, 530 8th Avenue # 6, San Francisco, CA 94118 USA.

ওয়েবসাইট

১. https://bn.wikipedia.org/wiki/ইন্দ্রপাল, প্রবেশ ১৯ মে ২০২৩, সময়: সকাল ১১:৩০ মিনিট।

২. https://bn.wikipedia.org/wiki/মনসা, প্রবেশ ২৪ জুন ২০২২, সময়: সকাল ১১:০০ মিনিট।

৩. ব্রিটিশ শাসনামলে ১৮৭২ সালে মি. এইচ বিভারলি-এর নেতৃত্বে বাংলায় প্রথম আদমশুমারি হয়। এই আদমশুমারিতে ৬টি বিভাগের অধীনে সমগ্র বাংলার চিত্রটি ঐতিহাসিক বিচারে গুরুত্বপূর্ণ। Report on Census of West Bengal -1872 অনুসারে নিম্নে বিভাগ ও জেলাগুলোর নাম দেয়া হলো:

ক) বর্ধমান বিভাগ: পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাসমূহ

১. বর্ধমান, ২. বাকুড়া, ৩. বীরভূম, ৪. মেদিনীপুর, ৫. হুগলী ও ৬. হাওড়া

খ) প্রেসিডেন্সি বিভাগ: মধ্যাঞ্চলীয় জেলাসমূহ

১. চব্বিশ পরগণা, ২. কলকাতা, ৩. নদীয়া ও ৪. যশোর

গ) রাজশাহী বিভাগ:

১. মুর্শিদাবাদ, ২. দিনাজপুর, ৩. মালদহ, ৪. রাজশাহী, ৫. রংপুর, ৬. বগুড়া ও ৭. পাবনা

ঘ) কোচবিহার বিভাগ:

১. দার্জিলিং, ২. জলপাইগুড়ি ও ৩. কোচবিহার

ঙ) ঢাকা বিভাগ: পূর্বাঞ্চলীয় জেলাসমূহ

১. ঢাকা, ২. ফরিদপুর, ৩. বাখেরগঞ্জ, ৪. ময়মনসিং, ৫. সিলেট ও ৬ কাছাড়

চ) চট্টগ্রাম বিভাগ:

১. চট্টগ্রাম, ২. নোয়াখালি, ৩. ত্রিপুরা, ৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ৫. পার্বত্য ত্রিপুরা

৪. Repor on Census of India 1901, page no 16. ব্রিটিশ ভারতে ১৯০১ সালে আদমশুমারি অনুসারে ৮টি বিভাগ হলো:

ক) পশ্চিমবঙ্গ: বর্ধমান বিভাগ

১. বর্ধমান, ২. বাকুড়া, ৩. বীরভূম, ৪. মেদিনীপুর, ৫. হুগলী ও ৬ হাওড়া

খ) বাংলা: প্রেসিডেন্সি বিভাগ

১. চব্বিশ পরগণা, ২. কলকাতা, ৩. নদীয়া ও ৪. যশোর

গ) উত্তরবঙ্গ: রাজশাহী ও কোচবিহার বিভাগ

১. মুর্শিদাবাদ, ২. দিনাজপুর, ৩. মালদহ, ৪. রাজশাহী, ৫. রংপুর, ৬. বগুড়া, ৭. পাবনা, ৮. দার্জিলিং, ৯. জলপাইগুড়ি, ১০. কোচবিহার ও ১১. সিকিম

ঘ) পূর্ব বাংলা: মধ্য ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ

১. ঢাকা, ২. ফরিদপুর, ৩. বাখেরগঞ্জ, ৪. ময়মনসিং, ৫. সিলেট, ৬ কাছাড়, ৭. চট্টগ্রাম, ৮. নোয়াখালি, ৯. ত্রিপুরা, ১০. পার্বত্য চট্টগ্রাম, ১১. খুলনা ও ১২. পার্বত্য ত্রিপুরা

ঙ) উত্তর বিহারঃ

১. মধ্য মোজাফ্ফরপুর, ২. দ্বারভাঙ্গা, ৩. চম্পারান, ৪. সরণ, ৫. ভাগলপুর ও ৬ পুর্নিয়া

চ) দক্ষিণ বিহারঃ

১. পাটনা, ২. গয়া, ৩. শাহাবাদ ও ৪. মঞ্জের

ছ) উড়িষ্যাঃ

১. অংগুল ছাড়া সমগ্র উড়িষ্যা অঞ্চল

জ) ছোট নাগপুর প্লটঃ

১. ছোট নাগপুর, ২. সাঁওতাল পরগনা ও ৩. অংগুল

ক্ষেত্র সমীক্ষণ ও সাক্ষাৎকার

১. ইউসুফ হাসান অর্ক আয়োজিত দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর থানার শিল্পী শ্রী পিযুষ চন্দ্র রায় ও তার দলগত পরিবেশনা 'কান্দনী বিষহরির গান'-এর ক্ষেত্র-সমীক্ষণে অংশগ্রহণ এবং সাক্ষাৎকার, তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২০।

২. লালমনিরহাট জেলার সদর থানার বড়বাড়ি ইউনিয়নের শিল্পী শ্রী উত্তম কুমার ও তার দলগত পরিবেশনা 'পদ্মাপুরাণ গান'-এর ক্ষেত্র-সমীক্ষণে অংশগ্রহণ এবং সাক্ষাৎকার, তারিখ ১৭, ১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১।

'পদ্মাপুরাণ গান'-এর দলের সদস্যদের নামের তালিকা ও সাধারণ পরিচিতিঃ

নাম	পেশা	নির্বাহী দায়িত্ব	অন্যান্য
উত্তম কুমার (৩৫)	কৃষিকাজ	দলপ্রধান (মূল গায়েন-অভিনেতা)	পদ্মাপূরাণ গান, কীর্তন, কুশান গান
আয়নাল হক (৬১)	কৃষিকাজ	অভিনেতা (দোয়াড়ি)	বেহুলার গান, কুশান গান, পদ্মাপুরাণ গান
গোলক চন্দ্র বর্মণ (৬০)	কৃষিকাজ	বাইন (খোল বাদক)	পদ্মাপুরাণ গান, কুশান গান
ফুল বাবু (৪০)	কৃষিকাজ	হারমোনিয়াম	পদ্মাপুরাণ গান
ভোজন চন্দ্র রায়	কৃষিকাজ	জুরি	সঙ্গীত
জলেশ্বর	কৃষিকাজ	জুরি	সঙ্গীত
জমশের আলি	রিকশাচালক	কর্নেড	পদ্মাপুরাণ গান
অনন্ত চন্দ্র রায়	কৃষিকাজ	অভিনেতা, ঝাঝড়	পদ্মাপুরাণ গান
আনোয়ারুল ইসলাম (৩৮)	কাঠমিস্ত্রি	অভিনেতা (সনোকা, ছুকরি)	পদ্মাপুরাণ গান, পালাগান
আপন চন্দ্র রায়	ছাত্র, কৃষিকাজ	অভিনেতা (বেহুলা, ছুকরি)	পদ্মাপুরাণ গান, কুশান গান, ঝুমুর যাত্রা, পালাগান
সাইফুল	কৃষিকাজ	অভিনেতা (ছুকরি)	পদ্মাপুরাণ
রানা	কৃষিকাজ	অভিনেতা (ছুকরি)	পদ্মাপুরাণ

[Abstract : Performance of `Padma-r Gaan' and `Kandani Bishahari-r Gaan' is based on the Hindu goddess Manasa, which still can be witnessed in the village of Bengal. Both the form deals with the story of worshiping `Manasa', goddess in traditional Hindu religion. These are among the popular narrative performances of the medieval period where human desire and hope are believed to be fulfilled by the grace of the deities. The worshiped gods and goddesses of Mangalkavya curse and punish the people if they do not get the desired worship from people. If they get worship, they provide them happiness and peace out of their satisfaction. That is why the people of this region make special vows to Goddess Manasa; obey the mind on belief. All these gods and goddesses are remembered as saviors from spiritual crisis, crop failure, pestilence, sickness, lack of prosperity, obstacles in the journey, miscarriage etc. The traditional theatrical form of Bangladesh called Padma-r song/ Bishahari-r song/ Kandani Bishahari-r song etc. are seen to be performed especially in different villages of Kurigram, Gaibandha, Rangpur, Lalmonirhat, Nilphamari and Dinajpur districts.

According to the general trend of the folk art like ritual dramas, the organizers seek the grace of the desired gods and goddesses by worshiping them. The dramatic presentation of the collective sense-belief takes place in the performance in the presence of the people of the respective societies. The main them of the research is to explore the philosophy of contiguity of the `Padma-r Gaan' and `Kandani Bishahari-r Gaan' in different districts of North Bengal.]